KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজপত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7.5" x 6"
Vol. & Number : 7/1 7/2 7/5 7/6	Year of Publication : বৈশাখ ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ ভাদ্র ১৩২৭ আশ্বিন ১৩২৭
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র কলিকাতা-৭০০ ০০৯

নব-রূপকথা।*

—:০:—

বীরবল বলেছেন—

"আমরা রূপকথা লিখতে বসলে, হয় তা কিছুই হবে না, নয় রূপক হবে; কেননা রূপকথার জন্ম সত্যযুগে, আর রূপকের জন্ম সভ্যযুগে।" (শিশু সাহিত্য)

বীরবলের এমত গ্রাহ্য করতে আমাদের তিলমাত্র দ্বিধা হবে না, যদি রূপক বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে আমাদের মনে কোনো স্পষ্ট ধারণা থাকে।

কোনো একটি ভাব, আইডিয়া কিম্বা দার্শনিক মতকে শরীরী করে তোলা, যা কেবল মনের পদার্থ, তাকে বস্তুর রূপ দিয়ে ইন্দ্রিয়গোচর করা, ভাষান্তরে যা abstract তাকে Concrete করাই হচ্ছে রূপকের উদ্দেশ্য। কতকগুলি ভাবের সমষ্টিকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট করে আমরা যেমন জড়পদার্থ দিয়ে দেব-দেবীর প্রতিমা গড়ি, সাহিত্যের জগতেও আমরা তেমনি আমাদের একটি বিশেষ মনোভাবকে তার বিভাব অনুভাব দিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ করে রূপক গড়ি। প্রতিক ও রূপক এ দু'য়েরই মূলে আছে মানুষের একই প্রবৃত্তি - যার শুধু নাম আছে,

* শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, চন্দননগর 'প্রবর্ত্তক' কার্য্যালয় হইতে— "নব-রূপকথা" নামক সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপে লিখিত—সম্পাদক।

তাকে রূপ দেবার, যা অমূর্ত্ত তাকে মূর্ত্ত করবার প্রবৃত্তি। অতএব প্রতিকের সত্য যেমন তার দেহে নেই, আছে তার অন্তরে—রূপকের সত্যও তেমনি তার পদার্থে নেই, আছে তার অর্থে। রূপকের সঙ্গে রূপ কথার মূল প্রভেদ এই যে, এর প্রথমটির পদার্থ হচ্ছে কৃত্রিম, দ্বিতীয়টির অলৌকিক।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী যে দুটি রূপকথা লিখেছেন, সে দু'টিই হচ্ছে মূলত রূপক। এ দু'টি কথার কথাবস্তু উপলক্ষ্য মাত্র, বক্তার আসল লক্ষ্য হচ্ছে তর্কযুক্তির বলে নয়, গল্পচ্ছলে একটি বিশেষ মনোভাবকে সাকার করা এবং সেই সাকার ভাবকে শ্রোতার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করা। বীরবল ঠিকই বলেছেন, "সভ্যযুগে রূপকথা জন্মায় না, জন্মায় শুধু রূপক"।

(২)

এখন দেখা যাক, তথাকথিত এই রূপকথা দুটির মনের গুপ্ত কথা কি? লেখকের আসল বক্তব্য এই যে, "জগৎ মিথ্যা"—এ কথাটা মিথ্যা কথা। সকলেই জানেন যে, জগৎ যে মিথ্যা এটি হচ্ছে একটি দার্শনিক মত, অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের মত। আমি এস্থলে অদ্বৈতবাদীর নাম বিশেষ করে উল্লেখ করলুম এইজন্য যে, শঙ্করমত ও বেদান্তমত একবস্তু নয়। বেদান্তের বহুভাষ্যকার এবং বেশির ভাগ ভাষ্যকার শঙ্করমত খণ্ডন করে গেছেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীও মায়াবাদ ওরফে বিবর্ত্তবাদের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করেছেন; কিন্তু তা দার্শনিক হিসেবে নয়। তিনি শঙ্করের লজিকের ভুল ধরতে বসেন নি। তাঁর অন্তরাত্মা মায়াবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে,

কেননা তাঁর বিশ্বাস জীবনের উপর উক্ত দর্শনের প্রভাব অতি মারাত্মক। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই মায়াবাদ মনের ভিতর একবার শিকড় গাড়লে মানুষকে অশক্ত অকর্ম্মণ্য নিরানন্দ ও নির্জ্জীব করে ফেলে। মানুষ তখন একেবারে জড়ভরত হয়ে পড়ে। লেখকের কল্পিত বৃদ্ধগৃধ্র হচ্ছে একটি আদর্শ, অর্থাৎ—চূড়ান্ত মায়াবাদী। তিনি ক্ষুদ্র দোয়েলকে বলেছিলেন—

"মনে রাখিও বৎস, ভগবান নিরাকারেই সত্য সাকারে ভুল; নিরাকারে তিনি আনন্দময়, সাকারে তিনি দুঃখময়।··· ··· ··· আরো জানিও বৎস, জীবনে যাহা সহজ, যাহা সরল, যাহা স্বত তাহাই ভগবানের পথে অন্তরায়! জীবনে যাহা প্রেয় বলিয়া মনে হইবে তাহাকেই বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে, কারণ ভগবান যিনি তিনি শ্রেয়, প্রেয় নহেন।"

এরূপ দার্শনিক মত সেই গ্রাহ্য করতে পারে, যার বুকের রক্ত একেবারে জল হয়ে গিয়েছে। কেননা দার্শনিক-চিন্তা জীবনের সকল সত্য থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন না হলে এহেন সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছতে পারে না। মানুষের প্রকৃতিতে যা সহজ, যা সরল, যা স্বত তাকে অগ্রাহ্য করায় মানুষ তার মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করে। সুতরাং যার অন্তরে প্রাণের শক্তি আছে, অস্তিত্বের আনন্দ আছে, সে যদি তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে ফুটিয়ে তোলবার আনন্দলাভ করতে চায় তাহলে "জগৎ মিথ্যা" এ কথাটা সে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য। মানবাত্মা সহজভাবে সরলভাবে স্বতপ্রণোদিত হয়ে ও-কথায় কখনই সায় দিতে পারে না, কেন না ও-মত গ্রাহ্য করা আর আত্মহত্যা করা একই কথা। আর এক কথা, জগৎকে মিথ্যা বললে সে মিথ্যা ত হয়ে যায়ই

না বরং উল্টে সাংঘাতিক সত্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতির উপর আত্ম-শক্তির বলে আমরা যদি প্রভুত্ব না করি তাহলে আমরা প্রকৃতির দাস হয়ে পড়ি—বস্তুগত্যা আজকের দিনে আমরা যা হয়ে পড়েছি।

এস্থলে যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, মানব জীবনের অনুকূল কি প্রতিকূল, সেই হিসেবেই কি সত্যকে জানতে হবে, না মানতে হবে? আমাদের জ্ঞানচক্ষুতে যদি ধরা পড়ে যে, এ জগৎ যথার্থই মিথ্যা তাহলেও কি মানুষের সুখলোভী মনকে প্রবোধ দেবার জন্য বলতে হবে, এ জগত সত্য? এ প্রশ্নের উত্তরে সুরেশচন্দ্র বলবেন যে, এ সৃষ্টি যদি সত্য সত্যই একটি রূপকথা হয় তাহলেও সে রূপ আমরা চোখ ভরে দেখব, সে কথা আমরা কান ভরে শুনব, কেন না এই রূপকথার রস উপভোগ করবার জন্যই আমরা হয়েছি ও আছি। এই Concrete জগতের প্রতি লেখকের স্বভাবজ নাড়ীর টান আছে।

(৩)

একদল লোকের বিশ্বাস যে, বাঙলা হচ্ছে সংস্কৃতের অপভ্রংশ অতএব বাঙলা, ভাষা হিসেবে ইতর। এ অপবাদ অমূলক। অপভ্রষ্ট হলে অনেক সময়ে যে ভাষার মর্য্যাদা বাড়ে তার প্রমাণ সংস্কৃতের উপকথা বাঙালীর মুখে হয়ে উঠেছে রূপকথা। উপকথা রূপহীন হতে পারে, কিন্তু রূপকথার বিশেষত্বই এই যে, সে কথার গায়ে রূপ আছে।

রূপকথা আর রূপক যে এক বস্তু নয়, সে বিষয়ে বীরবলের মত পূর্ব্বে উদ্ধৃত করেছি। তিনি আরো বলেন—

"এই রূপকের মধ্যেই হাজারে একখানা ছেলেদের কাছে নব রূপকথা হয়ে দাঁড়ায়, যথা—Don Quixote, Gulliver's Travels ইত্যাদি।"—

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বীরবলের মতে রূপকের মধ্যে হাজারে ন'শ নিরানব্বইখানা রূপকথা নয়। আমি তাঁর চেয়ে একটু বেশি যাই। আমার মতে রূপকের মধ্যে হাজারে ন'শ নিরানব্বইখানা অতি বিরূপকথা। পূর্ব্বেই বলেছি যে, মনোভাবকে ইন্দ্রিয় গোচর, দেহী করে তোলাই হচ্ছে রূপকের উদ্দেশ্য। এ চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেমন অযথা, তেমনি নিস্ফল।

ভাবেরও একটা দেহ আছে এবং সে দেহ গড়ে তুলতে হয়, ভাবের সঙ্গে ভাব যোগ করে। নানারূপ আইডিয়ার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আমরা একটা দার্শনিক মতেরও পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি গড়ে তুলতে পারি, যদি আমরা জানি কোন্ ভাবের সঙ্গে কোন্ ভাব খাপ খায়, আর যদি আমরা নানা ভাবকে একত্র করে তাদের যথাযথ বিন্যাস করে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরকে খাপে খাপে মিলিয়ে গেঁথে এক করে দিতে পারি। শঙ্করদর্শন লোককে এত যে মুগ্ধ করে তার কারণ, তিনি দর্শনের রাজ্যে লজিকের সব চাইতে বড় কারিগর। দার্শনিক তিনি মোটেই ছিলেন না কেননা প্রকৃতির, কি বাইরের কি অন্তরের, কোনো সত্যের তিনি যে কখনো দর্শন লাভ করেছিলেন তাঁর লেখায় তার কোনো পরিচয় নেই। এ সত্ত্বেও তিনি যে বড় দার্শনিক বলে

গণ্য, তার একমাত্র কারণ, তাঁর লজিকের হাত ছিল অসাধারণ তৈরী। বাজিকর যখন তার মুঠোর ভিতর থেকে টাকা বেমালুম উড়িয়ে দেয় তখন কি আমরা সে টাকার শোকে অভিভূত হই, না তার হাত সাফাই দেখে অবাক হই এবং সেই সঙ্গে মহা আনন্দ অনুভব করি? টাকার ভাবনা যে তখন আমরা ভাবি নে, তার কারণ আমরা জানি সে টাকা আছে, পরে আবার ফিরে পাব। তেমনি শঙ্কর যখন এ জগৎটাকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে বেমালুম উড়িয়ে দেন তখন আমরা তাঁর হাত সাফাই দেখে অবাক হই এবং সেই সঙ্গে মহা আনন্দ অনুভব করি, জগৎ খোয়া গেল বলে কাঁদতে বসিনে, কারণ মনে মনে জানি জগৎটা আছে; বই বন্ধ করলেই আবার সেটি ফিরে পাব। সে যাই হোক, ভাবের দেহ বস্তু দিয়ে গড়বার চেষ্টায় তার ধর্ম্ম নষ্ট করা হয়, অতএব ও চেষ্টা অযথা।

তারপর এ চেষ্টা হাজারে ন'শ' নিরানব্বই ক্ষেত্রে নিষ্ফল। রূপক যদি ভাবের তর্ক দেহকে রেখায় রেখায় অনুসরণ করে তাহলে যা সৃষ্ট হয়, তা একটা কিম্ভূত-কিমাকার কঙ্কাল মাত্র। সে বস্তু জীবন্ত ত নয়ই, তার গায়ে রক্তমাংসের সম্পর্ক পর্য্যন্তও থাকে না। মূর্ত্তি গড়তে গিয়ে তার কঙ্কাল গড়ায় মানুষে কৃতিত্বের পরিচয় দেয় না, আর দ্রষ্টার চোখে সে কীর্ত্তি হয় অসহ্য। এক জ্ঞানী ছাড়া অপর সকলের চোখেই কঙ্কাল হচ্ছে একটি বিশ্রী জিনিস; এই কারণেই সাহিত্য জগতে রূপক হচ্ছে একটি বিশ্রী জিনিস।

তবে বীরবল বলেছেন যে, রূপকের মধ্যে হাজারে একখানা যথার্থ রূপকথা হয়ে দাঁড়ায়। সুরেশচন্দ্রের হাতে দুটি রূপকই রূপ-

কথা হয়ে উঠেছে। এ দুটির ভিতর আর যে বস্তুর অভাব থাক, রূপের অভাব নেই।

(৪)

রূপক তাঁর হাতেই রূপকথা হয়ে ওঠে, যাঁর কাছে তার ভাববস্তুটা গৌণ হয়ে কথাবস্তুটা মুখ্য হয়ে ওঠে, যিনি ভাবের মূর্ত্তি গড়তে বসে কিসের মূর্ত্তি গড়তে বসেছেন সে কথা ভুলে গিয়ে মূর্ত্তি গড়বার আনন্দে মত্ত হয়ে ওঠেন। তিনিই তাঁর রচনাকে অপরের ইন্দ্রিয়গোচর করতে পারেন, যাঁর সকল ইন্দ্রিয় সজীব ও সজাগ। আর তিনিই কল্পনাকে জীবন্ত করে তুলতে পারেন যাঁর জীবজগতের সঙ্গে পরিচয় আছে, আর যিনি জীবনকে সকল মন-প্রাণ দিয়ে সানন্দে আঁকড়ে ধরতে পারেন। এই রূপকথার লেখক এই রূপরসগন্ধস্পর্শময় জগতের ঐশ্বর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে বিভোর। তারপর জীবের অন্তরে যে-আশা আকাঙ্খা, যে-আনন্দ, যে-উদ্যম, যে-শক্তি ও যে-গতি আছে, লেখকের কাছে সেই সবই হচ্ছে মানবপ্রকৃতির সার সত্য। এই কারণেই তিনি মায়াবাদের প্রতিবাদী এবং এই কারণেই তিনি তাঁর প্রতিবাদকে রক্ত-মাংসের দেহ দিতে এবং তার অন্তরে প্রাণসঞ্চার করতে কৃতকার্য্য হয়েছেন। সুরেশচন্দ্র লিখতে বসেছিলেন রূপক; কিন্তু লিখে উঠেছেন রূপকথা।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, রূপকথা অলৌকিক কথা। সুরেশচন্দ্র "নব রূপকথায়" ভারতের অতীত সভ্যতার যে ছবি এঁকেছেন, সে ছবি খুব সম্ভবত প্রকৃত নয়। তাতে কিছু আসে যায় না। তিনি আমাদের ইতিহাস শেখাতে বসেন নি, তিনি কল্পনার চক্ষে যে ছবি

দেখেছেন সেই ছবিই আমাদের চোখের সুমুখে ধরে দিতে চেয়েছেন এবং তাতে যে কৃতকার্য্য হয়েছেন তার কারণ তাঁর কল্পনা ঐতিহাসিকের নয়, চিত্রকরের কল্পনা। ভারতবর্ষের ইতিহাস তাঁর কাছে হচ্ছে একটি বিরাট চিত্রশালা। সাহিত্যে তিনি সেই চিত্রশালারই বর্ণনা করতে ব্রতী হয়েছেন। সুরেশচন্দ্রের কল্পনার বিশেষত্বটুকু তুলনার সাহায্যে বোঝাতে চেষ্টা করব। Venice-এর চিত্রকরগণ যে চোখ দিয়ে তাঁদের সমসাময়িক স্বনগরীকে দেখেছিলেন, সুরেশচন্দ্র সেই চোখ দিয়েই স্বদেশের অতীতকে দেখেছেন। ভাসের নাটকে পড়েছি, একব্যক্তি একটি ছবি দেখে আনন্দে এই বলে চীৎকার করে উঠেছিলেন—"অহো কি বর্ণাঢ্যতা!" Venetian চিত্রকরদের আঁকা-ছবি দেখলে সকলের মুখ দিয়েই স্বতই উচ্চারিত হয়, "অহো কি বর্ণাঢ্যতা!" তাদের আর্টের সমস্ত ঝোঁকটা ছিল বর্ণের উপর, আকারের উপর নয়। যা-কিছু উজ্জ্বল, যা-বর্ণাঢ্য তাঁদের চোখ স্বভাবতই তার উপরে পড়েছে, আর তাঁদের রঙের তুলি তাই চির-দিনের জন্য পটস্থ করে রেখেছে! সুরেশচন্দ্রের রূপকথা পড়বার সময় আমার চোখের সুমুখে Tintoretto-র এক একখানি ছবি ফুটে ওঠে। এ চিত্রকরের কাছে মানুষের জীবনযাত্রা হচ্ছে আদ্যোপান্ত একটি শোভাযাত্রা, তাই তিনি Venice-এর উৎসবের ছবি সব এঁকে গিয়েছেন, এবং সে সব ছবি মানবের নয়নের চির-উৎসব। নরনারীর উন্নত পরিণত দেহ, উজ্জ্বল রূপ, প্রফুল্ল যৌবন, নানাবর্ণের বিচিত্র বেশ, দীপ্ত রত্ন-আভরণ, এই সকলের একত্র সমাবেশে সে চিত্র ঐশ্বর্য্যবান। তার উপর Venetian চিত্রকরেরা আলো ভালবাসতেন তাই সুরেশচন্দ্রের ভাষায় বলা চলে যে, সে চিত্র "আলোর স্পর্শে

আনন্দের আতিশয্য সহ্য করিতে না পারিয়া গালভরা হাসি লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।" সুরেশচন্দ্রের চোখে আমাদের অতীতের যে মূর্ত্তি ধরা পড়েছে সে মূর্ত্তিও উৎসবের ঐশ্বর্য্যময় আনন্দময় মূর্ত্তি। তাঁর কল্পনা পুষ্টিমার্গের পথিক।

সুরেশচন্দ্রের আত্মা হচ্ছে ঐশ্বর্য্যভক্ত। এস্থলে "ঐশ্বর্য্য" শব্দ আমি তার সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করছি। যে-কর্ম্ম, যে-ব্যবহার, যে-কীর্ত্তির ভিতর মানুষ এই সত্যের পরিচয় দেয়, যে তার-অন্তরে ঈশ্বরের বিভূতি আছে, সুরেশচন্দ্রের মন-প্রাণ তাতেই মেতে ওঠে। যার ভিতর দীনতা, হীনতা, কৃপণতা, কাপুরুষতার পরিচয় পাওয়া যায় সুরেশচন্দ্রের আত্মা তার প্রতি স্বতই বিমুখ। আমাদের এই বর্ত্তমান বিরাট জাতীয় দৈন্যের মধ্যে যদি কোনো স্বপ্ন দেখতে হয় ত এই ঐশ্বর্য্যের স্বপ্নই দেখা কর্ত্তব্য। যিনি সে স্বপ্ন দেখতে পারেন তিনি ত আমাদের সুমুখে জীবনের নতুন আদর্শ খাড়া করে দেন এবং সেই সঙ্গে আমাদের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলেন। এ আদর্শকে আমি নূতন আদর্শ বলছি এই কারণে যে মানুষে অতীতের মায়াদর্পণে অধিকাংশ সময়ে শুধু ভবিষ্যতেরি চেহারা দেখে।

(৫)

যাঁর মনে যে-ভাবই থাক, সে তা প্রকাশ করতে না পারলে তার কথা সাহিত্য হয় না। সাহিত্যের গুণ ভাষার রূপের উপরই প্রধানত নির্ভর করে। সুতরাং এখন সুরেশচন্দ্রের ভাষার বিশেষত্বের পরিচয়

নেবার চেষ্টা করা যাক। সুরেশচন্দ্রের ভাষা বর্ণাঢ্য। তিনি বাক্যের গঠনের উপর ততটা ঝোঁক দেন না, যতটা দেন পদের বর্ণের উপর। তিনি সেই শব্দ বেশি ব্যবহার করেন, যা শুনলে আমাদের চোখের সুমুখে ছবি ফুটে ওঠে। তাঁর ভাষার দ্বিতীয় গুণ, তার ঐশ্বর্য্য। ভাষা প্রয়োগে তাঁর কোনোরূপ কার্পণ্য নেই। তাঁর রচনার ভিতর কথা সব ভিড় করে আসে, পরস্পর ঠেলাঠেলি করে গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে যায়। কিন্তু তাঁর লেখা পড়ে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি ইচ্ছা করে এতকথা জড় করেন না। তাঁর ভাষার এই আতিশয্যের মূল হচ্ছে তাঁর মন। ভাব তাঁর মনের ভিতর টগবগ্ করে, তারপর সেই ভাব শব্দের আকার ধরে উছলে পড়ে। তাই তাঁর সকল লেখার মধ্যেই আত্মপ্রকাশের আনন্দ-ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যায়। শব্দের দ্বিত্ব তাঁর অতিশয় প্রিয়। "পত্রে পত্রে" এমন কি "ছত্রে ছত্রে," "বনে বনে," "ফুলে ফুলে," "গাছে গাছে," "কুলে কুলে" প্রভৃতি ডবল শব্দ আমাদের চোখে পড়ে। প্রথমে মনে হয়, এ হচ্ছে তাঁর রচনারীতির একটা মুদ্রাদোষ, ইংরেজীতে যাকে বলে mannerism. তবে একটু নিরীক্ষণ করে দেখলেই দেখা যায় যে, এ দ্বিত্ব তাঁর ভাষার একটা কৃত্রিম অলঙ্কার নয়। অলঙ্কারের নিয়মভঙ্গ করেই তিনি এই দ্বিত্বের সৃষ্টি করেন। এর কারণ, এক কথায় একটা ভাব প্রকাশ করায় তাঁর মনস্তুষ্টি হয় না, কেননা তাঁর মনের আবেগ তিনি কিছুতেই স্বল্প কথার গণ্ডীতে আবদ্ধ করতে চানও না, পারেনও না। তাঁর ভয় যে, বেশি চাপাচাপি করলে তাঁর ভাষা হয়ত প্রাণহীন হয়ে পড়বে; কিন্তু তিনি চান যে তাঁর ভাষা সর্ব্বাঙ্গে প্রাণবন্ত হোক। তাঁর এ ইচ্ছাও পূর্ণ হয়েছে। তাঁর ভাষা সাবেগ

কিন্তু অসংযত নয়, প্রচুর কিন্তু প্রগলভ নয়। তাঁর লেখার ভিতর প্রাণের উচ্ছ্বাস, গতি, লীলা ভঙ্গী সবই আছে। এই রূপ কথা দুটি, একটি জ্যান্ত মানুষের জ্যান্ত মনের জ্যান্ত ভাষায় আত্মপ্রকাশ অতএব যথার্থ সাহিত্য।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

ওমর খৈয়াম।

—:*:—

["সওগাত" নামক যে একখানি বাঙলা মাসিক পত্র আছে এ কথা সম্ভবত অধিকাংশ বাঙালা পাঠকই জানেন না ; অন্তত দু'দিন আগে আমি যে জানতুম না একথা নিশ্চয়। আমার কোনো বন্ধুর প্রসাদে এ পত্রের সঙ্গে হালে আমার পরিচয় ঘটেছে। উক্ত পত্র হতে ওমর খৈয়াম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ সবুজপত্রে পুন প্রকাশিত করবার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারলুম না। এই প্রবন্ধটি যিনি পাঠ করবেন তিনিই প্রমাণ পাবেন যে বাঙলা ভাষা শুধু আমাদের নয়, বাঙলার মুসলমানদেরও মাতৃভাষা। এ শ্রেণীর লেখা দেখে মনে হয় যে, বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের দানের মূল্য কোনো অংশে কম হবে না। উদ্ধৃত প্রবন্ধের বিশেষ মর্য্যাদা এই যে, এর লেখক একজন ফারসি-নবীশ। ওমরের কবিতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ইংরাজি-অনুবাদের মারফৎ। মূলের সঙ্গে অনুবাদের যে সম্পূর্ণ মিল নেই—ফিট্‌জ্-জেরাল্ডের হাতে পড়ে ওমর যে শুধু ইংরাজি পোষাক নয় সেই সঙ্গে বিলেতি মূর্ত্তিও ধারণ করেছেন, এ গুজব আমরা বহুদিন থেকে শুনে আসছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ফারসি ভাষা না জানার দরুণ ইংরাজি অনুবাদে ওমরের কবিতা যে কতদূর রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে তা বলা আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। বহু ইংরাজ সমালোচকের মতে ওমরের কবিতা মূলে কাচ, ফিট্‌জ্-জেরাল্ডের স্পর্শে তা মণি হয়ে উঠেছে। এ মত যে কতদূর সঙ্গত তার প্রমাণ পাঠকমাত্রেই উদ্ধৃত প্রবন্ধ হতে পাবেন।

আমি পূর্ব্বে আভাস দিয়েছি যে, এই মুসলমান লেখকের বাঙলা খাঁটি-বাঙলা। কিন্তু তাঁর ভাষার এই একমাত্র গুণ নয়। তাঁর লেখা পড়ে মনে

হয় যে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট পরিচয় আছে, কেননা তাঁর রচনার ভিতর ঠিক ঠিক সংস্কৃত কথাগুলি ঠিক ঠিক জায়গায় বসে গিয়েছে। আর এ কথাও অস্বীকার করবার জো নেই যে, সংস্কৃত শব্দের অযথা প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ থেকে রচনাকে মুক্ত রাখতে হলে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে লেখকের পরিচয় থাকা আবশ্যক। এই লেখা পড়ে আমার আর একটি কথা মনে হয়েছে যে, এ প্রবন্ধ বাঙালী ছাড়া আর কোনো ভারতবাসী লিখতে পারত না। আমাদের বাঙলা সাহিত্যের একটা বিশেষত্ব আছে, যা পরকে বোঝানো কঠিন কিন্তু নিজে বোঝা শক্ত নয়। যদিও লেখক ধর্ম্মে মুসলমান তবুও তিনি যে জাতিতে বাঙালী তার পরিচয় তাঁর লেখায় আগাগোড়া পাওয়া যায়। আজ-কাল এ দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের মিলনের কথা নিত্য শোনা যায়। কিন্তু আমাদের পরস্পরের যথার্থ মিলন হবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে। কেননা মনোজগতের মিলই হচ্ছে মনের মিল, সে মিল কোনো সাংসারিক উদ্দেশ্য-মূলক নয়, অতএব তার আর কোনো মার নেই। আমার আশা, বাঙলা সাহিত্যই হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিচারে বাঙলার লোককে একজাত করে তুলবে।

সম্পাদক]

* * * *

সত্য বটে ওমর খৈয়ামের কবিতা পারস্যদেশে অথবা ভারতবর্ষে সমাদরে গৃহীত হয় নাই এবং ওমর খৈয়ামের যে আজ বিশ্বব্যাপী খ্যাতি তাহা যে ইউরোপের অনুগ্রহে ইহাও সত্য। ওমরের সহিত আমাদের প্রথম ঘনিষ্ট পরিচয় ফিজ্ জিরেল্ডের দৌত্যের গুণে। কিন্তু মূল পারশী পড়িয়া আমার মনে হয় যে, ফিজ্-জিরেল্ড এই দৌত্য কার্য্যে প্রকৃত ওমর খৈয়ামের মনের ভাবের উপর নিজের মনের ভাবের ছাপটা দিয়াছেন, এত অধিক পরিমাণে আজ যে ওমর আমাদের

নিকট পরিচিত—সে প্রকৃত ওমর নহে,—ওমরের ছদ্মবেশধারী ফিজ্‌জিরেল্ড। কান্তি বাবু মূলের সহিত পরিচিত কিনা আমি সঠিক জানিনা, কিন্তু তাঁহার অনুবাদ পড়িয়া মনে হয় যে তিনি ফিজ্‌জিরেল্ডকেই মূল ধরিয়া অনুবাদ করিয়াছেন এবং সেই জন্য তাঁহার প্রদর্শিত ওমর খৈয়ামও প্রকৃত ওমর খৈয়াম নহে।

কান্তি বাবুর পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী। তিনি 'ফার্সি আমরা জানি নে' বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। অগ্রহায়ণের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত জলধর সেন কান্তি বাবুর পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনিও লিখিয়াছেন 'মূল ফরাসীতে (ফার্সিতে?) কি আছে জানি না'। তাঁহারা উভয়েই খৈয়ামের কবিতার দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন এবং মূলের সহিত পরিচিত না থাকায় তাঁহারা উভয়েই ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী লিখিয়াছেন,—

"ওমারের সকল কবিতার ভিতর দিয়ে যা ফুটে উঠ্‌ছে, সে হচ্ছে মানুষের মনের চিরন্তন এবং সব চাইতে বড় প্রশ্ন :—

"কোথায় ছিলাম, কেনই আসা, এই কথাটা জান্‌তে চাই"

* * * *

যাত্রা পুনঃ কোন লোকেতে? * *

এ প্রশ্নের জবাবে ওমর খৈয়াম বলেন :—

"সব ক্ষণিকের, আসল ফাঁকি, সত্য-মিথ্যা কিছুই নাই।"—

ওমর যে সেকালের মুসলমানসমাজে উপেক্ষিত হয়েছিলেন, এবং

একালের ইউরোপীয় সমাজে আদৃত হয়েছেন, তার কারণ তাঁর এই জবাব। যাঁরা মুসলমানধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাঁদের এ মত শুধু অগ্রাহ্য নয়—একেবারে অসহ্য; কেননা এ কথা ধর্ম্মমাত্রেরই মূলে কুঠারাঘাত করে। অপর পক্ষে এ বাণী মেনে নেবার জন্য এ যুগের ইউরোপের মন সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। ইউরোপের মন একান্ত বিজ্ঞান-চর্চ্চার ফলে, খ্রীষ্টধর্ম্মের উপর তার প্রাচীন বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিল; কিন্তু তার পরিবর্ত্তে কোনো নূতন বিশ্বাস খুঁজে পায় নি। সুতরাং ওমরের কবিতায় বর্ত্তমান ইউরোপ তার নিজের মনের ছবিই দেখতে পেয়েছিল। এই হচ্ছে প্রথম কারণ—যার দরুণ ওমরের বাণী ইউরোপের মনকে এতটা চঞ্চল করে তুলেছিল।

* * * *

তিনি আবিষ্কার করেছেন যে—

"সদ্য ফলের আশায় মোরা মর্‌ছি খেটে রাত্রি দিন
মরণ-পারের ভাবনা ভেবে আঁখির পাতা পলকহীন।
মৃত্যু-আঁধার মিনার হতে মুয়েজ্জিনের কণ্ঠ পাই—
মূর্খ তোরা, কাম্য তোদের হেথায় হোথায় কোথাও নাই।"

* * * *

ওমর খৈয়ামের মতে.....আসল সত্য এই যে, জগৎও মিথ্যা, ব্রহ্মও মিথ্যা।"

* * * *

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এক্ষেত্রে ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। * * ব্রহ্ম মিথ্যা একথা ওমর কখনই বলেন নাই। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য,

এবং আর সমস্তই মিথ্যা, এই কথাই তিনি বারম্বার তাঁহার কবিতায় লিখিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্ম আছে ; নিশ্চয় আছে ; ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। যত সংশয়, যত প্রশ্ন, যত কলহ এই ব্রহ্মের স্বরূপ লইয়া মাত্র। ওমর লিখিয়াছেন,—

কত্‌রা বেগ্‌রিস্ত কে আজ বহর জুদায়েম হামা।
বহর বর্‌ কত্‌রা বেখন্দিদ কে মায়েম হামা।
দর হকিকৎ দিগরে নিস্ত—খোদায়েম হামা।
লায়েক আজ গরদশে এক নোক্তা জুদায়েম হামা॥

বিন্দু কাঁদিয়া কহিল, "হায়! আমি জলধি হইতে পৃথক হইলাম"। জলধি হাসিয়া কহিল, "আমি সর্ব্বব্যাপি"॥ সত্যই আর কিছুই নাই—শুধু আছেন খোদা। ঠিক যেন একটী বিন্দু বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে এবং বহুতর বিন্দুর ন্যায় দেখাইতেছে॥

গাহ্‌ গশ্‌তা নেহাঁ রু বাকসে না মুমায়ী।
গাহ্‌ দর সুরে কৌন ও মকান পয়দায়ী॥
ইঁ জলওয়াগরী বা খেশতন বেন্‌মায়ী।
খুদ্‌ আইনে আইয়ানী ওখুদ্‌ বিনায়ী॥

মাঝে মাঝে তুমি বদনমণ্ডল সকল-চক্ষুর অন্তরাল কর। মাঝে মাঝে তুমি বিশ্বরূপে আপনাকে প্রকাশ কর॥ এই রহস্যের দ্রষ্টাও তুমি স্রষ্টাও তুমি। তুমিই দৃষ্টবস্তু, তুমিই দর্শন॥

ওমরের এইরূপ আরও অনেক রোবাইয়াৎ * আছে—যাহা হইতে

* হুইনফিল্ডের ওমর খৈয়ামের দ্বিতীয় সংস্করণের ২৬৯, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৯৫, ৪০২ প্রভৃতি সংখ্যক চতুষ্পদী।

স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ব্রহ্মের সত্বা সম্বন্ধে ওমরের মনে কখনও কোন প্রশ্নের উদয় হয় নাই। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে ওমর খৈয়ামের কবিতা পারস্যে এবং ভারতবর্ষে অনাদৃত হওয়ার কারণ কি এবং তাঁহার কবিতার প্রতি অক্ষরে যে প্রশ্ন ফুটিয়া উঠিতেছে সে প্রশ্ন কি? উত্তর হইতেছে এই যে, ওমর খৈয়াম জন্মিয়াছিলেন একাদশ শতাব্দীতে কিন্তু মনটী ছিল তাঁহার বিংশ শতাব্দীর। সেই জন্যই তিনি সেকালের লোকের নিকট উপযুক্ত সম্মান পান নাই। এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যহ আমাদের চক্ষের সমক্ষে দেখিতে পাইতেছি। যাহারা আপনাদের সমসাময়িক সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া দূর ভবিষ্যতের দিকে দ্রুত ধাবিত হয় তাহাদিগকে হয় সমসাময়িকেরা পশ্চাতে টানিয়া ধরিয়া রাখে, না হয় তাহাদিগকে দলছাড়া একঘরে করিয়া নিজেদের আত্মসম্মান বজায় রাখে। ওমর খৈয়াম বাস করিতেন নিশাপূরে। তথায় শাস্ত্রকারদিগের অসীম প্রতিপত্তি ছিল এবং তাঁহাদের অনুগ্রহে অনেককেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ করিবার অভিযোগে দণ্ডগ্রহণ করিতে হইত। ৪৮৯ হিজরিতে নিশাপুরে ধর্ম্ম লইয়া একটী ভীষণ অন্তর্বিগ্রহ হয়। বলা বাহুল্য যে যাঁহারা লোকের অন্ধ বিশ্বাস লইয়া ব্যবসা করেন, তাঁহারা খৈয়ামের মত অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে আমল দিবেন না ইহা সুনিশ্চিত। ফলে ঘটিয়াও ছিল তাহাই। স্বল্প সংখ্যক গুণগ্রাহী সুধীজন ব্যতীত ওমরের কবিতাকে কেহ পছন্দ করিত না। এবং পরবর্ত্তী যুগ সমূহে এসিয়ার রাজনৈতিক গগন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার সাহিত্য-জগতও ঘোর ঘনঘটায় আবৃত হইয়াছিল ; কাজেই এসিয়াবাসী কেহ সাহিত্য-গগনের এই লুপ্ত তারকাটীকে খুঁজিয়া বাহির করে নাই—ইহাকে আবিষ্কার করিবার

গৌরব, অন্যান্য গৌরবের সহিত ইউরোপের ভাগ্যেই পড়িয়াছে। এই স্থলে ন্যায়ের অনুরোধে ইহাও বলা আবশ্যক যে, এক পক্ষে শাস্ত্রকারগণ যেরূপ ওমরের প্রতি বিরাগী ছিলেন, ওমরও তাহাদিগকে তেমনি অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ওমর অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। নমুনা স্বরূপ একটী উদ্ধৃত করা গেল :—

শেখে বা জনে ফাহেশা গোফ্‌তা—মস্তী।
হরলহজা বা দামে দীগর পা বস্তি॥
গোফতা, শেখা হর্ আঁচে গোফতি হস্তম্।
আম্মা তু চুঁনাঁকে মি নোমায়ী হস্তী?

বারনারীকে দেখিয়া শেখ বলিলেন, "তুই মাতাল। অনুক্ষণ তুই পরপুরুষ সহবাস করিস"॥ উত্তর করিল। হে শেখ! তুমি যাহা কিছু বলিলে সমস্তই সত্য। কিন্তু তুমি বাহিরে দেখিতে যেরূপ অন্তরেও কি তদ্রূপ?" ধর্ম্মের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অনেক ভণ্ডই এ পৃথিবীতে যশঃ মান খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি লাভ করে।

এই শ্রেণীর আর একটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"আয় রফ্‌তা ও বাজ আমদা ও খম্ গশ্‌তা।
নামৎ জে মিয়ানে মর্দ্দমান গুম্ গশ্‌তা॥
নাখুন্ হামা জমা আমদা ও সুম্ গশ্‌তা।
রেশ আজ পসে কোঁন আমদা ও দুম্ গশ্‌তা॥

তুমি প্রস্থান করিয়াছিলে এবং পুনরায় আসিয়াছ—চতুষ্পদ রূপ ধারণ করিয়া। মানব জাতির মধ্য হইতে তোমার নাম লুপ্ত হইয়াছে।

তোমার নখ জমাট হইয়া খুর হইয়াছে। তোমার শ্মশ্রু পশ্চাতে গিয়া লাঙ্গুলের আকার ধারণ করিয়াছে।

কথিত আছে খৈয়াম একটী গর্দ্দভ দেখিয়া এই কবিতাটী আবৃত্তি করিয়াছিলেন। গর্দ্দভ নাকি পূর্ব্বজন্মে একটী মোল্লা ছিল—খৈয়াম তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে, ওমর কোন্ সমস্যার অর্থ বোধ করিতে গিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিয়াছিলেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার চিত্তে সংশয়ের লেশমাত্রও ছিল না। কিন্তু এই ব্রহ্মের স্বরূপ কি; এই জগৎ-সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি; আমরা কোথা হইতে আসি; কোথায় যাই; কেনই বা আসি; কেনই বা যাই; কেহ বা ভাগ্যবান হয় কেন; কেহ চোখের জলে বসন তিতাইয়া একটা দীর্ঘ হতাশের বোঝা বহিতে বহিতে মরে কেন, এ দু'দণ্ডের জীবনের অর্থ কি; ইহার মূল কি?—এই সকল প্রশ্ন ওমরের চিত্তে সর্ব্বদা জাগিত। এবং এই সকল প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া তাঁহার কবিচিত্ত তাঁহার বক্ষপঞ্জর চূর্ণ করিয়া বাহির হইবার জন্য সর্ব্বদা আকুলি বিকুলি করিত।

সয়ের আমদম্ আয় খোদা আজ পস্তিয়ে খেশ।
আজ তঙ্গ্ দেলি ও আজ তিহি দস্তিয়ে খেশ॥
আজ নিস্ত্ চুঁহস্ত্ মিকুনি বেরুঁ আর।
জিঁ নীস্তেম বা-হুরমতে হস্তিয়ে খেশ।

"হে প্রভু! আমার এই হীন অবস্থায় আমি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার এই দুর্ভাগ্য, এই দারিদ্র্য॥ তুমি নাস্তি হইতে অস্তি সৃষ্টি

কর। তুমি আমাকে আনয়ন কর,—এই মায়াময় নাস্তি হইতে তোমার সত্য অস্তির মধ্যে॥"

ব্রহ্মের স্বরূপ কি, ওমর কেন, সকল জিজ্ঞাসু হৃদয়েই এই প্রশ্নের উদয় হয়। আমাদের সৌভাগ্যই হউক, আর দুর্ভাগ্যই হউক আমরা সকলেই জন্মগ্রহণ করি হয় মুসলমান, না হয় খৃষ্টান, না হয় হিন্দু, না হয় বৌদ্ধ, না হয় আর কোন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া; অর্থাৎ আমাদের জন্মগত সংস্কারের সহিত কোন না কোন ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট থাকে।

তাহার পর আসে পারিবারিক এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত সংস্কার। এবং এই সকলের সহিত থাকে ব্যবহারগত সংস্কার। এই সমস্ত সংস্কার মিলিয়া আমাদিগকে এক রকম করিয়া গড়িয়া তোলে। যাহারা দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে এই সকল সংস্কারকে গ্রহণ করিতে পারে তাহারা শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করে; আর যাহারা তাহা পারে না তাহাদের ওমরের মত দুর্গতি হয়। তাহাদের মনের মানুষটী বাহিরের মামুলি পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট না হইয়া জগতের অন্তরের প্রকৃত রহস্যের নগ্ন মূর্ত্তিটীর অনুসন্ধানে বহির্গত হয় এবং তাহাদের লাভ হয় শুধু ব্যর্থ প্রয়াসের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। আর ওমরের মত কবির সেই শ্বাস বাহির হয় করুণ মর্ম্মভেদী কবিতার আকারে। ব্রহ্মের স্বরূপ কি? তিনি কি কোরাণবর্ণিত আল্লা, না বাইবেল বর্ণিত গড, না ইহুদি-ধর্ম্মগ্রন্থ বর্ণিত জিহোভা? কবি লিখিতেছেন ঃ—

বুৎখানা ও কাবা খাঁনায়ে বন্দগীস্ত।
নাকুস জদন্ তরানায়ে বন্দগীস্ত॥
জন্নার ও কলীসায় ও তসবিহ্ ও সলিব।
হক্কা কে হামা নেশানায়ে বন্দগীস্ত॥

মন্দির এবং মস্‌জিদ উভয় উপাসনা গৃহ, গির্জ্জার ঘণ্টার শব্দ উপাসনা করিতেই আহ্বান করে, গির্জ্জা এবং মস্‌জিদ, তস্‌বি এবং জপমালা, প্রকৃতপক্ষে সমস্তই তাঁহারি আরাধনার জন্য।

সত্য সত্যই কি পাপী নরক ভোগ করিবে এবং পুণ্যাত্মা স্বর্গবাসী হইবে?

দর সুমা' ও মাদ্রাসা ও দায়ের ও কনিশ্‌ত।
তরস্‌দা জে দোজখন্দ ও জোয়েয়ায়ে বেহিশ্‌ত॥
আঁকস্ কে জে আসরারে খোদা বা খবর আস্ত্।
জিঁ তোখম দর আন্দরুণে খুদ হিচ নাকিশ্‌ত॥

ইহুদি, খৃষ্টান এবং মুসলমান ধর্ম্মমন্দিরে ও বিদ্যালয়ে, মানুষ স্বর্গের সুখ লাভ এবং নরক-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণের পন্থা অন্বেষণ করে। কিন্তু যে খোদার রহস্য ভেদ করিয়াছে, সে এই সকল মূর্খতা হইতে আপনাকে রক্ষা করে।

মুসলমানধর্ম্ম বলিতেছে এই ধর্ম্ম সত্য অন্য ধর্ম্ম মিথ্যা। আবার খৃষ্টানেরা বলিতেছে খৃষ্টধর্ম্ম একমাত্র সত্য ধর্ম্ম, অন্য ধর্ম্ম নরকের পথ প্রদর্শন করে। যাঁহারা অগ্নি উপাসক তাহাদের ব্রহ্মই বা কিরূপ? আবার যাহারা পুতুল পূজা করে তাহাদের ব্রহ্মের সহিতই বা সত্য পরমব্রহ্মের সম্পর্ক কি? ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ব্যর্থ, তাহা আদিমকাল হইতে মানুষ মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। ওমর সে কথা জানিতেন।

দর্ পর্দ্দায়ে আস্‌রার কসে রা রাহ্ নিস্ত্।
জীঁ তা'বিয়া জানে হিচ কস্ আগা নিস্ত্॥
জুজ্ দর দেলে খাঁকে তিরা মনজেল গাহ্ নিস্ত্।
আফসোস্ কে হঁ ফসনহা কোতা নিস্ত্॥

এই পর্দ্দার অন্তরালে কাহারও গতিবিধি নাই। মর্ত্ত্য মানব কেহই এই রহস্য অবগত নহে॥ মৃত্তিকার নিম্নে অন্ধকার গৃহে মানবের শেষ গতি।—হায়! হায়! এই দুঃখের কাহিনীর অন্ত নাই॥

কিন্তু এ জ্ঞান থাকিয়াও মানব অজ্ঞান। ভালবাসা যেমন মানুষের মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও তেমনি। ভালবাসিয়া নিরাশার ফসল অর্জ্জন ব্যতীত আর কিছু লাভ হইবে না জানিয়াও যেমন শত শত গুণী, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভালবাসায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, তেমনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ব্যর্থ জানিয়াও সহস্র সহস্র মানব এই চিন্তায় অহরহ জর্জ্জরিত ও ক্লিষ্ট হইয়াও এই চিন্তা হইতে বিরত হইতেছে না। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার আর এক নাম হইতেছে বিশ্বসৃষ্টির গূঢ় রহস্য কি তাহা উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা। এই রহস্য যুগে যুগে, সকল জাতির, সকল মানবের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। এই দুটী প্রশ্ন যেমন একাদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি ওমরের মনে জাগিত, তেমনি বিংশ শতাব্দীর ইংরাজ কবি টেনিসনের মনেও উদয় হইয়াছিল। টেনিসন তাঁহার In Memoriam-এ লিখিয়াছেন :—

O life as futile then, as frail!
O for thy voice to soothe and bless!
What hope of answer or redress?
Behind the veil, behind the veil,

ওমর লিখিয়াছেনঃ—

আস্রারে আজল রা না তু দানি ও না মন্।
ও ইঁ হরফে মোয়েম্মা না তু খানি ও না মন্॥

হস্ত আজ পসে পর্দ্দা গোফ্‌তো গুয়ে মন ও তু।
চুঁ পর্দ্দা বেরাফ্ তন্দ না তু মানিও ন মন॥

ফিজ্ জিরেল্ড অনুবাদ করিতেছেন :—

There was a door to which
I found no key
There was a veil past which
I could not see!
Some little talk awhile
of Me and Thee
Thou seemest—and then no
more of thee and me,

কান্তি বাবু অনুবাদ করিয়াছেন ঃ—

রুদ্ধ-দুয়ার জীবন-ঘরের কুঞ্জিকাটির নাইকো খোঁজ,
দেখ্‌তে না পাই ভাগ্য-বধূর ঘোমটা-ঢাকা মুখ-সরোজ;
বারেক দুবার কণ্ঠে কাহার শুন্‌ছি শুধু নামটা মোর—
কয়দিনই বা?—সাঙ্গ তো হয় সর্ব্বনামের নেশার ঘোর!

কিন্তু টেনিসন এই behind the veil এই পর্দ্দার অন্তরালটাকে settled fact চূড়ান্ত নিষ্পত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে রাশি রাশি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। আর ওমর ইহাকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার হতাশ রোদনধ্বনি এখনও মানবের কর্ণে পশিয়া তাহার হৃদয়কে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে।

ওমরের কবিতায় কেহ কেহ কেবল মদিরার গন্ধ আর রূপসীর পাৎলা ঠোঁটের জিয়ান-রসের স্বাদ পাইয়াছেন, কিন্তু ওমর খৈয়াম যেমন 'ব্রহ্ম মিথ্যা' কখনও বলেন নাই, তেমন শুধু নাচ, গান, পান করার তথ্য প্রচার করার জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই। যদি বাস্তবিক পক্ষে তাহাই হইত তাহা হইলে তাঁহার কবিতা ব্যর্থ হইত ও নিকৃষ্টতর হইত। প্রকৃত পক্ষে এ কবিতাগুলি অভিমানের ও বিদ্রোহের কবিতা। কবি বলিতেছেন, "হে শাস্ত্রকার, তুমি আমাকে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারিবেনা অথচ আমাকে শত সহস্র 'না'র মধ্যে জড়াইয়া আমার জীবনটাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবে—তাহা হইবে না। আমি তোমার কথা মানিব না। হে আমার চিত্ত! তুমি কেন বৃথা অসম্ভবকে সম্ভব করিবার প্রয়াস পাইয়া কষ্ট পাইতেছ? এস বিশ্রাম কর। অর্থহীন তর্ক ছাড়িয়া দিয়া চল আমরা নিভৃতে গিয়া কোনও তরুণীর অধর সুধা পান করিয়া শ্রান্তি দূর করি।"

কিন্তু ওমরের চিত্ত কি এই আহ্বান শুনিয়াছিল? ওমর কি আপন ইন্দ্রিয়ের সেবায় মগ্ন হইয়া ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা বিস্মরণ হইয়াছিলেন?—না, তাহা নহে। এ ক্ষণিকের বিদ্রোহের পরেই আবার মন সেই পুরাতন চিন্তা লইয়া ব্যস্ত হইত। মাঝে মাঝে যখন অবসাদ আসিত তখন এক একবার হৃদয়ে বিরক্তির উদয় হইত এবং তখনই এই শ্রেণীর কবিতার জন্ম হইত।

পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন ধর্ম্মমতের বিরোধী ওমরের জীবনের প্রধানতম সমস্যা ছিল। এই বিরোধের মধ্যে সত্যিকার ব্রহ্মের স্থান কোথায়? এক স্থানে কবি লিখিতেছেন:—

বুৎ গোফ্‌ত বা বুৎ পরস্ত্ কা'য়ে আবেদে মা।
দানি জে চেরুয়ে গশ্‌তাই সাজেদে মা॥
বর মা বাজমালে খুদ্ তজল্লি করদস্ত্।
আঁকস্‌কে জে তুস্ত নাজের আয় সাহেদেমা॥

মূর্ত্তি তাহার উপাসককে জিজ্ঞাসা করিল, "হে আমার উপাসক! তুমি জান কি, কেমন করিয়া তুমি আমার উপাসক হইলে? ইহার রহস্য হইতেছে এই যে যিনি তোমার নয়নের ভিতর দিয়া আমায় দেখিতেছেন, একদিন তিনি আমায় তাঁহার সৌন্দর্য্যের ছটায় উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

অপর এক স্থানে কবি লিখিতেছেন,—

"বাতু বাথারাবাত আগর গোয়েম রাজ।
বেহ্ জাঁকে কুনম্ বেতু বামেহ্‌রাব নমাজ॥
আয় আউয়াল ও আখেরে হামা খলকান তু।
খাহি তু মরা বেসোজ ও খাহি বেনওয়াজ্।

"এই তো জানি বন্ধু আমার—সত্য জ্যোতির প্রকাশটুক্
—রাগেই কিম্বা প্রেমেই ফুটে—ভরায় যা মোর আঁধার বুক,
নিমেষ তরে পাই যদি তার আভাসটা মোর পান্‌শালায়
আঁধার-ঘেরা মন্দিরেতে কেনই যাব—কোন্ জ্বালায়!"

ওমর চাহিয়াছিলেন ধর্ম্মের আবরণ ভেদ করিয়া প্রকৃত সত্যের সাক্ষাৎ পাইতে। সে সাক্ষাৎকার লাভ তাঁহার ঘটে নাই;—ঘটা সম্ভবও ছিল না, কেননা সে সত্য এতই উজ্জ্বল এতই তেজোময় যে

পয়গম্বর মুসার চক্ষুও উহা দেখিতে গিয়া অন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং তূর পর্ব্বতও উহাকে সহ্য করিতে না পারিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

নিয়তি এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার চিরন্তন দ্বন্দ্বও ওমরকে সতত ত্যক্ত করিত। তিনি লিখিতেছেন ;—

আয় রফ্‌তা বাচৌগানে কজা হামচুঁ গো।
চপ্‌ মি খুরদ্‌ ও রাস্ত রও হিচ মগো॥
কাঁকস্‌কে তোরা আফগন্দ আন্দর-তগ্‌ ও পো।
উদানদ্‌ উদানদ্‌ উদানদ্‌ উ॥

"নাইকো পাশার ইচ্ছাস্বাধীন—যেই নিয়েছে খেলায় তার,
ডাইনে বাঁয়ে ফেলছে তারে, যখন যেমন ইচ্ছা তার।
মানুষ নিয়ে ভাগ্য-খেলায় করেন যিনি কিস্তিমাৎ—
সবটা জানেন তিনিই শুধু,—জয় পরাজয় তাঁরই হাত।"

তবে স্বর্গ নরক কেন? তবে তিরস্কার পুরস্কার কেন? তবে মানুষকে কৃতকর্ম্মের জন্য বিচারের কষ্টভোগ করিতে হইবে কেন?

বস্তুতঃ ওমরের দর্শন—ব্রহ্মমিথ্যা, ইন্দ্রিয়গোচর অনিত্যকে যথাসম্ভব উপভোগ করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য—এই শিক্ষা দিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। ওমর কোনও মত প্রচার করিবার জন্য কবিতা লিখেন নাই। তাঁহার কবিতা তাঁহার হৃদয়ের আকুল ক্রন্দনের অভিব্যক্তি মাত্র। এই সকল কবিতা তাঁহার ব্যর্থ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার তপ্ত-দীর্ঘশ্বাস মাত্র। কিন্তু এ জিজ্ঞাসা ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নহে, এ জিজ্ঞাসা ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে।

উপসংহারে আমি সাহিত্যামোদী সকলকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন ওমরের এই অমর কবিতাবলী একবার পাঠ করেন। যাঁহারা মূল পারশি পাঠে অপারগ তাঁহারা যেন কান্তি বাবুর অনুবাদ-খানি পড়েন। যাঁহারা মূল পারশি পড়িতে পারেন তাঁহারাও যেন কান্তি বাবুর অনুবাদখানি পড়িতে না ভুলেন। এবং যাঁহারা মূল না পড়িয়াও ওমরের কবিতা সম্বন্ধে প্রকৃত কথা জানিতে চাহেন তাঁহারা যেন ই, এইচ হুইনফিল্ডের ওমর খৈয়ামের ভূমিকা পড়িয়া দেখেন।

তরিকুল আলম।

টীকা ও টিপ্পনি।

—:০:—

আমার লেখার সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে তথা-কথিত সাধুভাষার বিরুদ্ধে আমার একটি বিশেষ অভিযোগ এই যে, সে ভাষা অশুদ্ধ। সাধু লেখনীর দৌরাত্ম্যে সংস্কৃত শব্দসকল এত পীড়িত হয় যে সে সকল শব্দ যদি মৃত না হত ত পাঠকেরা এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠতেন। সংস্কৃত শব্দের অপ-প্রয়োগ ও দুষ্ট-প্রয়োগ আমার কাছে এতই বিরক্তিকর যে এ বিষয়ে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমপ্রমাদও আমি আর্ষপ্রয়োগ বলে শিয়োধার্য্য করে নিতে পারি নি। ভাষা সম্বন্ধে আমি একজন শুচিবাতিক গ্রস্ত লোক।

সমাজের পক্ষে কোনোরূপ বাতিকেরই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। কেননা বাতিকগ্রস্ত লোক প্রায়ই একদেশদর্শী হয়ে ওঠেন। যে বিষয়ে মানুষের বাতিক আছে সে বিষয়ের একটা দিকে তার চোখ এত বেশি করে পড়ে যে তার যে আর একটা দিক আছে তা সে দেখতেই পায় না। যাকে আমরা তীক্ষ্ণদৃষ্টি বলি আসলে তা সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি। অতএব যিনি আমাদের এ বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিতে পারেন, তাঁকে ধন্যবাদ দিতে আমরা বাধ্য।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন মহাশয় এ বিষয়ে যা লিখেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তিনি বলেন:—

"যখন কেহ বলে 'সংস্কৃতভাষায় এরূপ প্রয়োগ কখনো দেখি নাই' তখন সে 'সংস্কৃত সাহিত্য' অর্থেই 'সংস্কৃতভাষা' প্রয়োগ করে। এরূপ প্রয়োগ যে খুব সাধু নহে তাহা বলা বাহুল্য, কিন্তু কোনও সজীব ভাষায় বহুলোক যদি পুনঃ পুনঃ একটি শব্দ এক অর্থে ব্যবহার করে তবে ক্রমশঃ ঐ অর্থে উক্ত শব্দের সহিতে প্রয়োগের অধিকার লব্ধ হয়। কথাটা শুনিতে হয়ত হেঁয়ালির মত শুনাইবে, তথাপি ইহা ঠিক যে, ভ্রম, প্রমাদ ও আলস্যেও ভাষার পুষ্টি হয়।"

(ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, মাঘ—১৩২৬ পৃ, ১৬৬)।

* * * * *

উপরোক্ত কথা কটি যে সত্য সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। একই শব্দের যে বাঙলা ও সংস্কৃত অর্থ বিভিন্ন, এর ঝুড়ি ঝুড়ি উদাহরণ দেখানো যায়। এবং এর মধ্যে বহু শব্দ যে তাদের সংস্কৃত অর্থ বর্জ্জন করে বাঙলা অর্থ অর্জ্জন করেছে তার মূলে আছে ভ্রম, প্রমাদ ও আলস্য। চরিত্র না বদলালে চেহারা বজায় রেখে সে সকল সংস্কৃত শব্দ বাঙলাভাষায় স্থান পেত না। এক ভাষার পক্ষে অপর ভাষার কথা ধার করা যত সহজ, এক জাতির পক্ষে আর জাতির মনোভাব চুরি করা তত সহজ নয়। এবং এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য যে পরভাষার শব্দের অর্থ আপনার মনের মত করে বদলে নিতে না পারলে সে শব্দ কোনোজাতিই আত্মসাৎ করতে পারেন না। আর যা আমরা আত্মসাৎ করতে পারি নে তা নিজস্ব হয় না, পরস্বই থেকে যায়।

কবিরত্ন মহাশয়ের মত গ্রাহ্য করি বলে আমি আমার নিজের মত ত্যাগ করতে বাধ্য নই। কেন?—তা বোঝাবার চেষ্টা করছি।

কবিরত্ন মহাশয় বলেছেন যে "সাহিত্য" অর্থে "ভাষা" ও "ভাষা" অর্থে "সাহিত্য" শব্দের প্রয়োগ সাধু নয়। তাঁর এই মতের উপরই তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদের প্রতিষ্ঠা করছি। স্বীকার করলুম যে ভ্রম প্রমাদ ও আলস্যেও ভাষার পুষ্টি হয়; কিন্তু তাই বলে এ কথা স্বীকার করতে পারি নে যে ভ্রম প্রমাদ ও আলস্যে সাহিত্যের পুষ্ট হয়। ভাষা গড়ে ওঠে বহুযুগ ধরে বহুলোকের মুখে, কিন্তু সাহিত্য গড়ে তোলে একটি সময়ে একটি লোকে। ভাষাসৃষ্টি করে জাতি আর সাহিত্যসৃষ্টি করে ব্যক্তি। এ দুই সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও উপায় বিভিন্ন। সকলের কাছে ভাষা জীবনযাত্রার সহায় বলেই মূল্যবান, সাহিত্যে তা ভাবের প্রকাশক বলেই মূল্যবান। লৌকিকভাষা কর্ম্মকাণ্ডের, আর সাহিত্যের ভাষা জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্ভূত। সাহিত্য রচনা করতে হয় সজ্ঞানে, ভ্রম প্রমাদ আলস্য সে রচনার পুষ্টি সাধন করতে পারে না। সুতরাং সংস্কৃত শব্দের অপ-প্রয়োগ দুষ্ট-প্রয়োগ প্রভৃতি বাঙলা সাহিত্যে অমার্জ্জনীয়। এ উপায়ে কোনো লেখক সাহিত্যের ভাষার কিছুতেই পুষ্টিসাধন করতে পারেন না, কেননা তাঁর ভ্রম অপরে আত্মসাৎ করবে না। মেধাতিথি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, সাহিত্য সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। তাঁর মতে—"একের ভ্রান্তি জগৎভ্রান্ত করতে পারে না"। সাধুভাষার লেখকেরা এই বাক্যটি স্মরণ রাখলে বাঙলা সাহিত্য পড়ে আমাদের আর খুঁত খুঁত করতে হবে না।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

উপকথা।

—:*:—

বৃদ্ধ জেলে আর তার ছোট্ট ছেলে ভেলায় চড়ে' রোজ রাত্তিরে সমুদ্রে যায় মাছ ধরতে। ভেলার গলুয়ের কাছে বসে' জেলে তার জাল ফেলে আর মনে মনে ভাবে—কত না মাছ আজ সে ধরবে—কত রকমের—আর তাই সে বাজারে বেচ্‌বে কত চড়া দামে। ছেলেটা ভেলার পিছনে বসে' থাকে হাল ধরে'—আর তার দৃষ্টি থাকে সেখানে যেখানে ঢেউগুলো উঠছে পড়ছে এঁকছে বেঁকছে—আঁধার রাতে যখন পুঞ্জ ফেনার লম্বা রেখা উজ্জ্বল নীল আলো গায়ে জড়িয়ে অনেক দূর থেকে ছল্ ছল্ ছল্ ছল্ করে' দৌড়ে এসে ভেলার গায়ে ছনাৎ করে' ভেঙে পড়ে'—যেন রাশি রাশি চূর্ণ হীরা চারিদিকে ছড়িয়ে যায়, তখন সে ভাবে এসব কি? যখন চাঁদনী রাতে ফণার মত ঢেউয়ের মাথাগুলো চিকমিকিয়ে ওঠে—যেন ছোট ছোট পরীর মেয়েরা রূপোলি আঁচলে বুক ঢেকে হেসে কুটি কুটি হ'য়ে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে, তখন ছোট ছেলেটা ভাবে, এই ত আসল।

এমনি ক'রে দিন কাটে। ছোট্ট ছেলেটি বড় হ'তে থাকে আর সেই সঙ্গে তার নিজের চোখের আলোও নিভে আসতে থাকে। চাঁদনী রাতে সে ঝাপসা দেখতে সুরু করে, আঁধার রাত তার কাছে

কেবল নিবিড় কালো হ'য়ে ধরা দেয়। দিনের আলো ছাড়া আর তার কাছে আলো নেই। সেই দিনের আলোর মাঝে সমস্ত বস্তু তার বস্তুত্বের পরিসমাপ্তি নিয়ে তার চোখের আগে ধরা দেয়। ছোট্ট ছেলেটি কেমন একটা অস্বস্তি ভোগ করতে থাকে, মনে করে' কি যেন সে হারাতে হারাতে অগ্রসর হ'য়ে চলেছে। এই হারানো থেকে কি কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না? ক্রমে ক্রমে সে আরও বড় হয়ে ওঠে, হাল ছেড়ে সে জাল ফেলতে লেগে যায়, আবার সেও তেমনি করে ভাবতে সুরু করে—কত মাছই না সে ধরবে—কত রকমের, আর তাই সে বাজারে বেচবে কত চড়া দামে। তার চোখের সামনে সব কেমন বাস্তব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন সে ভাবে ছেলে বেলায় সে কি স্বপ্ন দেখেই না সময় নষ্ট করেছে। ধীরে ধীরে তার মনে মাছের হিসেবই বেশি চলে, তার মনের এপিঠ-ওপিঠ আনাচে-কানাচে কড়ির হিসেব দিয়ে ভরে যায়, তখন আর তার সে ছেলেবেলাকার স্বপ্নের কথা মনেই আসে না।

কিন্তু ঐ যে তার নিজের ছোট্ট ছেলেটি আবার আজ ভেলার পিছনে হাল ধরে বসে' তার নতুন চোখের তরুণ দৃষ্টির সামনে সাগরের নীল জল শাঁদা ফেনা চাঁদনী রাতের সোহাগ আবার তেমনি স্বপ্নের জাল মেলে দিয়েছে। ভেলার সামনে কড়ির হিসেব, ভেলার পিছনে বে-হিসেবী স্বপ্ন।

আবার এই ছোট্ট ছেলেটিও বড় হ'য়ে মাছের হিসেব করতে বসে যায়। আবার তার ছোট্ট ছেলেটি স্বপ্নের উদ্দেশ করতে জেগে ওঠে। ভেলার সামনেকার কড়ির হিসেব থামে না, তার পিছনের বে-হিসেবী স্বপ্নের জালেরও শেষ পাওয়া যায় না।

সাগরবুকে আবহমানকাল এমনি খেলা চলছে। আর তীরের ঝাপসা গাছেরা তাদের মাথা হেলিয়ে আবহমানকাল ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করছে, ওগো কোন্‌টা সত্যি—এ দু'য়ের কোন্‌টা অশান্ত সাগর আবহমানকাল পৃথিবীর পায়ে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে বলছে—সত্যি! ওগো ও-দুই-ই সত্যি—ও-দুই-ই!

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মন বদলানো।

বীরবল উপদেশ দিয়াছেন—"আমরা যদি সত্য সত্যই স্বজাতিকে "স্বরাট" করতে চাই তাহলে সব আগে আমাদের কর্ত্তব্য হবে নিজের নিজের মন বদলানো, চরিত্র বদলানো এবং তার জন্য চাই বহু পূর্ব্ব-সংস্কার, বহু অভ্যস্ত মত, বহু সঙ্কীর্ণ ধারণা বর্জ্জন করা"।

তা যদি হয় তাহলে বাঙলা মাসিকপত্রে হালে যে একটা ফ্যাশান দাঁড়াইয়াছে, সময়ে অসময়ে "East is east" কোট করিয়া কিপ্‌লিং-কে গালমন্দ বলা, সেই অভ্যাসটিও আমাদের বদলাতে হয়।

কারণ কিপ্‌লিং কি কেবলমাত্র Rudyard Kipling? ইংরাজ নামক যে এক আশ্চর্য্য মানবসংঘ কোন্ তিমির হইতে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া শতাব্দীতে শতাব্দীতে আপনার পাপ্‌ড়িগুলি দিকে দিগন্তে ছড়াইয়া দিল, যার হৃন্মর্ম্ম হইতে বাহির হইয়া এক বিশেষ সৌগন্ধ মানবের চিরন্তন ভাণ্ডারে জমা হইয়া গেল, বিশ্বমানবের দরবারে যার বক্তব্য শেষ হইতে হয় ত এখনো বাকী আছে। হইতে পারে অদ্য তার মঙ্গলশঙ্খ "ধূলায় পড়ে," এবং বীণা নীরব হইয়া গেছে, হইতে পারে কিপ্‌লিং তার জয়ঢাক—কিন্তু যে বাঁচিয়া আছে তার হাতে জয়ঢাকে কি করিয়া মৃদঙ্গের বোল উঠিতে পার তার প্রমাণ "Recessoinal"

* * * *

"If drunk with sight of power, we loose
Wild tongues that have not thee in awe,—
Such boasting as the gentiles use,
Or lesser breeds within the Law,—
Lord God of Hosts, be with us yet,
Lest we forget—lest we forget!

For heathen heart that puts her trust
In reeking tube and iron shard,—
All valiant dust that builds on dust,
And guarding, calls not thee to guard,—
For frantic boast and foolish word,
Thy mercy on thy people, Lord!

Amen."

(২)

আসল কথা যে-মন জীবিত, সে যেমন বলের সঙ্গে কাড়ে, তেমনি বলের সঙ্গে ছাড়ে। শান্ত নির্ম্মল উষা যেমন করিয়া ধীরে রৌদ্র-করোজ্জ্বল মধ্যাহ্নের মধ্যে পরিণতি লাভ করে, সত্ত্ব তেমনি অলক্ষিতে রজে স্ফূর্ত্তিলাভ করে। আকাশের বিপুল অবকাশের মধ্যে যে রশ্মি স্নিগ্ধ জ্বালাহীন, তা-ই ধরণীতে নামিয়া খরতাপ শোষক। জীবিত ভারতবর্ষে তাই ত্যাগ সত্য, রাজ্যেশ্বর যার পদানত সে বসনহীন

সন্ন্যাসী। তামসিকতার রিক্ততা লুব্ধ কুণ্ঠিত, "কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে হায় হায়"; শাকান্নের জন্য দ্বার হইতে দ্বারে বিতাড়িত, দারিদ্র্য ও অপমান স্বেচ্ছাবৃত নয়, ঊর্দ্ধ হইতে নিক্ষিপ্ত ও পুঞ্জে পুঞ্জে স্তূপীকৃত। তার প্রণিপাত একদিকে Lord of Ghosts-কে, অপরদিকে host of পাইক-বরকন্দাজকে। সে যেমন একদিকে আধ্যাত্মিকতার মদে মত্ত, অপরদিকে সব-চেয়ে দেহাত্মবাদী; "কামান-ধূম্র এবং রাষ্ট্র গৌরবের" পরে তার শ্রদ্ধা সব চেয়ে বেশি।

মনোরাজ্যে সমুদয় আবর্জ্জনাকে পরম সম্পত্তি বলিয়া ধারণা ও ধারণ করিবার যে প্রবৃত্তি তাই হচ্ছে চরম conservatism—এবং বীরবল ইহারই বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছেন।

(৩)

"Vested Interest" হইতেছে নবীনের প্রধান ও প্রথম বাধা।

সেদিন শোনা গেল একদল রায়ত তাদের জমিদারকে যাইয়া বলিল, সদর-খাজনা যা পাঠান তা আমরাই নিজ হাতে সরকারকে দিচ্ছি। কি ধর্ম্মে কি রাষ্ট্রে সর্ব্বত্রই মধ্যবর্ত্তী জনগণ মনঃপরিবর্ত্তনের প্রবল বিরোধী। কেননা তারও ত বাঁচা চাই—অনধিকারীর অনধিকার ও নাবালকের বয়ঃকনিষ্ঠতা তার অস্তিত্বের ওজর। পুরুত আসলে জমিদারের প্রধান পাইক—কেননা পুরুতের রাজ্য মানুষের মনে। এই কারণে সব দেশে সব কালে জমিদার পুরুতকে হাতে রাখিয়াছে। এবং বৈদেশিক ব্যুরোক্রাসি তাজমহলে হস্তক্ষেপ করিলেও কালীঘাটে করে নাই—কেননা কালীঘাট ফোর্ট উইলিয়মের

চেয়ে তার কম বড় দুর্গ নয়। Toleration নাস্তিকেও করে, এবং শ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা দুই-ই সমভাবেই তার কারণ হইতে পারে, এবং ও হচ্ছে পলিশির সেরা পলিশি।

এখন অদৃষ্টের বিধানে এই মধ্যবর্ত্তীদের হাতে সমুদয় ক্ষমতা রহিয়াছে—এবং তাদের প্রধান খুঁটা রহিয়াছে মানবমনের একটি অতি সাধারণ সত্যের উপর—সে হচ্ছে নতুনের প্রতি একটা সংস্কার-গত অবিশ্বাস। শিশুটি অপরিচিতের কোলে যাইবে না। যুগে যুগে বহু মানবের পায়ে পায়ে, "line of least resistance" ধরিয়া, যে পথ তৈরি হইয়াছে তাই সব চেয়ে সুবিধাজনক পথ হইবার সম্ভব, তাকে ত্যাগ করিবার প্রয়োজন কি? নিজেকে সে পথে খাপ খাওয়াইতে না পারিলে কেবল আপনারই অক্ষমতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রমাণ করা হয়। এবং সে অবস্থাতে দশজনের মত হইয়া চলিতে শেখা-ই জীবনের সাধনা হওয়া উচিত। অনেক লোকে যেখানে একমত সেখানেই ত বিজ্ঞতা।

(৪)

এদেশে অদ্য যদি কোনো একটা সত্যকে আর একটার চেয়ে বেশি করিয়া প্রচার করিবার দরকার উপস্থিত হইয়া থাকে তবে তা এই যে, wisdom আর truth আলাহিদা পদার্থ, এবং আয়তন ও সংখ্যার হিসাবে সত্যের মাপ হয় না। সত্য হচ্ছে একটি স্ফুলিঙ্গ যার কার্য্যাবলী আদপেই বুদ্ধিমানের মত নয়, এবং যার চেহারাও নেহাইৎ-ই দোহারা। তবু,

"মরে না মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে।"

"ন যদিদম্ ইমে উপাসতে," জনবর্গের সুমুখে যা বাস্তবিকরূপে গোচর, তা-ই সত্য না-ও হইতে পারে। সত্য দিনের আলোর মত স্পষ্ট হইয়াও আরব্য উপন্যাসের "সাগরের বুড়ো"। তাকে মুষ্টির মধ্যে বদ্ধ করা চলিবে না। সে জীবনের মত নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক। সে ভিতর হইতে আপনার জড়-কায়াকে চিরকাল নির্ম্মাণ করিতে করিতে চলিয়াছে—সে এক মুহূর্ত্ত থামিলে "উচ্ছিষ্যা উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর" ভারে। এদেশে সেই বস্তুপুঞ্জই পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিয়াছে। কে না জানে ভারতবর্ষের সভ্যতা আজ এক সুবিপুল debris—সে তার ঐতিহাসিকতাতে চমৎকারী হইতে পারে, আসলে কিন্তু প্রাণহীন আচারপরম্পরা।

(৫)

"অনেকদিন পরাণহীন ধরণী"। ফাল্গুনে সত্যের আগমনে যদি ধরণীর নাড়ীর মধ্যে জীবনের স্পন্দন সুরু হইতে পারে, তবে এ জাতের Inertia কি ভাঙিবে না? চাই গতির প্রেরণা। কিন্তু ধাক্কা কোথায় প্রথম পড়িবে, সেই হচ্ছে প্রশ্ন।

ব্যক্তির বিচারবুদ্ধির পিঞ্জর-মুক্তি যেন ঘটিল এবং সকলেই জানেন intellectual awakening এদেশে ঘটিয়াছে। এবং সম্ভবত এদেশের

বুদ্ধি কোনো কালেই অসাড় হইয়া ঘুমাইয়া ছিল না। আসল ব্যাধি মনের নয়, চরিত্রের। "ন চ মে প্রবৃত্তিঃ"-ই যে এ-দেশের ইতিহাসের ট্র্যাজেডি-র গোড়া, এ-সম্বন্ধে আর সন্দেহমাত্র নাই। "প্রবৃত্তি"-র গোড়ায় আছে "নিবৃত্তিঃ"—সংহতি এবং প্রসার যেমন জড়িত—এবং নিবৃত্ত হইতে চাহিলেও কেন যে নিবৃত্ত হইতে আসলে পারা যায় না, সেটা হচ্ছে মানুষের নৈতিক জীবনের প্রশ্ন। অদ্য সকল প্রশ্নের সার প্রশ্ন এই যে, মানবজীবনের ও-প্রশ্ন কেবলমাত্র destructive উপায়ে, কেবলমাত্র সংস্কারবর্জ্জন করিয়া সমাহিত হইবে কি না? কোনো নব সংস্কার অর্জ্জনের দরকার আছে কি না? এদেশের রাজনীতির হিসাবে অগ্রগামী-দলের কার্য্যকলাপের সম্বন্ধে অপবাদ এই যে তাঁরা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে চলেন সুমুখের পানে, সমাজের ক্ষেত্রে বিদেহী আত্মাদের মত উল্টা দিকে, পিছনে। আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণ আসলে বই-এর একই পাতারই দুই পৃষ্ঠা, ঠেলা-ই কি প্রকারে টানার চেহারা লয় তা জড় বিজ্ঞানের এক মূলসূত্র। সমাজের মন্দিরে ব্যক্তিকে বলি দেওয়ার মনোভাব, এবং India—Right or wrong এর মটো'র প্রেরণার মধ্যে তফাৎ কোনখানে? ভারতবর্ষ যদি বাঁচিয়া থাকে তবে মরিতে নয়, কিন্তু কোটী কল্প নরকে বাস করিতে প্রস্তুত। আর, হিন্দুসমাজ যদি বাঁচিয়া থাকে তবে বিধবা কাঁদুক, জ্ঞানের ক্ষুধায় অস্থির যুবক সমাজ কারাগারে আবদ্ধ থাকুক, জীবনের সকল প্রিয় ইচ্ছা গভীর কামনা রক্তজবার মত' শাস্ত্রের প্রস্তর বেদীর উপর অবলুণ্ঠিত হোক। মানুষকে নিষ্ঠাবান সমাজধর্ম্মপরায়ণ করিয়া দেখা আর পেট্রিয়ট্ করিয়া দেখা—এই উভয় দেখাই মানুষকে "উপায়" স্বরূপে দেখা। এই জন্যই এক জনের আয়োজন মানুষকে অতি-

বিশদজটিল তন্ত্রমন্ত্রের সুতায় পুঁৎলা নাচাইবার, আর এক জনের আয়োজন কুচ্‌কাওয়াজের গুঁতায় মানুষ-মারা যন্ত্র বানাইবার। নিষ্ঠার প্যারাডক্স্ এই যে তার সমুদয় দোহাই আধ্যাত্মিকতার, অথচ সে দাঁড়াইয়া আছে দেহাত্মবাদের উপরে, কেননা সত্যের প্রাণের সঙ্গে তার অপরিচয়, বস্তুর আয়তন লইয়াই তার যত কারবার।

এই সত্য জানাই সব চেয়ে বেশি দরকার হইয়াছে যে, মানুষ "উপায়" নয় কিন্তু নিজেই এক উদ্দেশ্য। "Know ye the truth, and the truth shall make you free." "আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা।" যুগ-যুগান্তর হইতে লক্ষযোজন দূরের তারকা যে কিরণের দূত পাঠাইয়া দিয়াছে, সে এই মাটির পৃথিবীতে নামিবে আমারই চোখে অঞ্জন পরাইবে বলিয়া। "কত কালের সকাল সাঁঝে" লোকে লোকান্তরে কত সুখে দুঃখে, কত বেদনায় ভুবনপ্লাবী জীবধারায় প্রতি নিমিষের বক্ষঃস্পন্দনের মধ্যে যে "চরণ ধ্বনি" বাজিয়াছে সে আমারই "বিজন ঘরের" দিকে এক নিভৃত সমারোহের দীর্ঘ অভিযান। সমস্ত ইতিহাস কিসের শাঁখ বাজাইতেছে? সমস্ত মানবের পরম সুখের বেদনা ও পরম দুঃখের সাধনা যদি না আমার জন্যই সঞ্চিত হইয়া রহিল, তবে এই দু'দণ্ডের নাট্যলীলার নিজের মধ্যে নিজের কোনো মানে নাই।

ভারতবর্ষে এক সময়ে প্রতি-মানবের এই চরম destiny-র বোধ জাগ্রত হইল বলিয়া, জীবনী-শক্তি যেমন করিয়া দেহকে ভিতর হইতে অভিব্যক্ত করিয়া তোলে এক অবিভ্যক্ত সমগ্রতার মধ্যে, যেখানে—গানের মধ্যে সুরগুলি যেমন সমঞ্জসীকৃত, তেমনি—প্রত্যেক আলাদা অঙ্গ আপন আপন ক্রিয়াগুলিকে স্বত-ই এক অন্তর্নিহিত লক্ষ্যের নিকে

অভিমুখীন করিয়া রাখিয়াছে,—ঠিক তেমনি ভারত-মনীষার গর্ভের মধ্য হইতে, হঠাৎ একদিন নয় কিন্তু কালে কালে, এক বিচিত্র সমাজ-ব্যবস্থা জন্মলাভ করিল। বর্ণাশ্রম তাই তখন স্থিতিস্থাপক ছিল—উদ্দেশ্য তখন জাগ্রত ছিল বলিয়া উদ্দেশ্যে পৌঁছানটাই সব চেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল—মৃত্যুর লক্ষণই হইতেছে, অ-নমনীয়তা, rigidity.

অতএব যদি ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা ও জাতির জীবনের সমস্যা গোড়াতে এক হয়, তবে এমন একজন বা একদল ব্যক্তির দরকার যিনি বা যাঁরা, আমাদের নেতাদের মত' দোদুল্যমান pendant নন। কিম্বা ব্যক্তির জীবনের গভীরতর সমস্যা সম্বন্ধে সচেতনমাত্র নন, কিন্তু এ দুয়ের সমাধানের প্রয়াসে সমস্ত জীবন-মন নিয়োগ করিতে প্রস্তুত। ভারতবর্ষের আসল সমস্যা, বাঙলায় বলিতে গেলে, ধর্ম্মের সমস্যা। ও শব্দটি ব্যবহারের মুস্কিল এই যে বঙ্গভাষার অপর অনেক শব্দের মত ও-শব্দটিও অতিব্যবহারের দরুণ লুপ্তার্থ। অনন্তকোটী নক্ষত্রের মাঝখানে পর্য্যায়ক্রমে রৌদ্রে ছায়ায় ঘেরাও এক মৃৎ-গোলকের উপরে ও ইতর জন্তু-পুঞ্জের মাঝখানে মননশীল মানুষ অকস্মাৎ আপনাকে নিক্ষিপ্ত দেখিতে পাইল—এখন সে কি করিবে, এ সকলের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি? ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং কামের তাগিদ মিটাইয়া দিয়াও জগৎ এবং মানবসমাজ ব্যক্তির মনের এই দুর্নিবার জিজ্ঞাসাকে নিরস্ত করিতে অপারগ হওয়াতে, জগৎ এবং মানব সম্বন্ধে সে থিওরি পাকাইতে বসিল। এবং মানবের সমুদয় ইতিহাস হইতেছে এই থিওরি পাকানোর ইতিহাস, এবং কে না জানে ইউরোপের বিগত এই বিপুল যুদ্ধ হইতেছে গণতন্ত্র ও একতন্ত্রের থিওরির-ই experiment মাত্র! এখন, যে-থিওরি সমুদয় দেশেকালে

খণ্ডিত থিওরিকে আত্মসাৎ করিয়া অখণ্ড, সে হচ্ছে সত্য, সে হচ্ছে জীবন-তত্ত্ব, সে-ই সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থাকে ধারণ করিতেছে বলিয়া তার নাম ধর্ম্ম।

দেখা গেছে ধর্ম্মের ক্ষুধা মানুষের জীবনের মধ্যে সত্য ক্ষুধা। আমার দেশকে "স্বরাট" করিবার আমার গরজ কি? ভাল খাইব পড়িব বলিয়া? ছেলেপুলেরা ভাল খাইবে পরিবে বলিয়া? অবশ্য তাহা হইলে, দেশের জন্য আত্মবলিদানের মানে বোঝা যায় না। অবশ্য ছাপার হরফে নাম লিখিত হইবার সম্ভাবনা মানুষকে যে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করাইতে পারে, তা কারও অগোচর নাই, তথাপি একথা কখনো মিথ্যা নয় যে, "man does not live by bread alone,"—কেবলমাত্র খাওয়া-পরার মধ্যে সেই উন্মাদনা নাই যা মানুষকে খাওয়া-পরার উপাদানস্বরূপ যে দেহ, তার বিসর্জ্জনে প্রবৃত্ত করাইতে পারে। ভবিষ্যদ্‌বংশীয়বর্গের কল্যাণ—এ হচ্ছে একটা আইডিয়া এবং বৃহৎ ভাবের প্রতি মানুষের আকর্ষণের প্রচণ্ডতার মানেই হচ্ছে মানুষের ভিতরকার ভূমাতত্ত্ব। দেশ সেবার নিজের মধ্যে নিজের কোনো মানে নাই—যেমন অর্থসঞ্চয় স্পৃহার নিজের মধ্যে নিজের কোনো মানে নাই, মানুষ নিজের মধ্যে যে একের সন্ধান পাইয়াছে তা সে বাইরেও দেখিতে চায়, তা-ই তার Science সেই এককে সে প্রাত্যাহিক জীবনের সুবিধার মধ্যে দেখিতে চায়—অর্থই মানুষকে আলাদা আলাদা করিয়া জীবনযাত্রার উপকরণজাল সংগ্রহ করিবার উৎপাৎ হইতে বাঁচায়; কিন্তু সেই অর্থের লিপ্সা যেমন মানবের মূল-তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি হারাইয়া আপনিই একান্ত হইয়া উঠিলে মানবের

অকল্যাণ, তেমনি যে দেশসেবার আসল মানে মানুষের চেতনার মনের প্রসার। সে যখন একান্ত হইয়া আপনিই end in itself হইয়া উঠে, তখনই হয় "বন্দেমাতরম্"-এর সৃষ্টি এবং আজকের দিনে উক্ত মন্ত্রের ক্রিয়া যে কি তা দেশে এবং বিদেশে সকলের কাছেই সুস্পষ্ট। মানুষ আপনাকে বড় করিবে, সে জগৎ এবং মানব-সমাজের মধ্যে যে অসীম-তত্ত্বকে আবিষ্কার করিল, সে দেখিল যে সে কেবল তত্ত্ব নয়, সে তার বন্ধু, সেজন্যই সীমায় তার লজ্জার আর অবধি নাই—যাকে ডাক দিয়াছেন "অনন্তং ব্রহ্ম", এই মানবত্বের মহলে।

ভারতবর্ষের অন্তরের কাতর প্রশ্ন আজ এই যে, কোথায় সেই মায়াকাঠি যার স্পর্শমাত্রে এই বিপুল ধ্বংস স্তূপের ছড়ানো ইঁট-পাথর কড়ি-বরগা এক নিমেষে যে-যার জায়গায় ছুটিয়া গিয়া বিশ্বের বিস্ময় শিল্প-প্রাসাদটিকে আর একবার দাঁড় করাইবে?

আমাদের জীবনের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগ্রত হইলে আমাদের সাহিত্যে তার ছাপ পড়িতে বিলম্ব হইবে না। ততক্ষণ এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ উত্থাপনের প্রয়োজন আছে। কেননা, আমরা আসলে কি চাই, তা আমরা-ই কি জানি? তাই জপের প্রয়োজন।

(৭)

যতক্ষণ আমাদের চরিত্র বদ্‌লানোর সূত্র বাহির না হইতেছে, ততক্ষণ আমাদের সাহিত্যের কার্য্য। কারণ, সাহিত্য will-কে তাড়া দিতে না পারিলেও মনকে নাড়া দিতে পারে। ইংরাজি সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইংরাজ-মন আমাদের মনকে যে নাড়া দিয়াছে, দেশের

মধ্যে লক্ষ লক্ষ টিকির সহসা খাড়া হইয়া ওঠা কি তারই পরিচয় নয় ? তৈলাক্ত টিকি মেকি আধ্যাত্মিকতায় যতই ঝিকিমিকি করিতেছে, আমরা ততই জানিতেছি "Recessional"-এর মধ্যে ইংরাজ-ইতিহাস তথা ইংরাজ-চরিত্রের যে গভীর বাণী আছে, সেই বাণীর জন্য আমাদের পক্ষে উক্ত তথাকথিত "জড়বাদী"-দের মনের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যত দরকার, আমেরিকায় সন্ন্যাসী পাঠানোর তত নাই।

শ্রীমণি গুপ্ত

পলাশ।

—:০:—

আমি সে পলাশ, জন্ম লভিনু
খর নিদাঘের রুদ্রতাপে!
মধু-মাধবের বাসর অন্তে,
না জানি কাহার কঠিন শাপে।

অন্তিম শ্বাস ফেলি বসন্ত
চলি গেল যবে সুদূর পুরে,
বন-বীথিকার উৎসব মাঝে
উৎসের ধারা সরায়ে দূরে,—

ঘুমের জড়িমা ছাইয়া আসিল
দিগ্বধূদের নয়ন পরে,
ধরণী-আনন ম্লান হয়ে গেল
নব-বিরহের বিষাদ ভরে—

সেইক্ষণে আমি জন্ম লভিনু,
সদ্যশোকের তড়িৎশিখা!
গত রজনীর ফুল্ল আসরে—
নিখিল বেদন ললাটে লিখা।

চিরদহনের জীবন আমার
দীপ্তি লভিল দৈন্য মাঝে!
বিশ্বের দুখ বক্ষে বরিয়া,
ফুটিয়া উঠিনু মলিন সাঁঝে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়

মাভৈঃ।

—:০:—

কিসের শঙ্কা দয়িত তাহার,
কিসের ভয় গো আর,
তোমার বাণীটি শুনেছে যে জন
কোথা তার সংসার!

কোথা তার কাছে বন্ধু স্বজন,
গুরুজন গৃহজ্বালা,
বিত্তের রাশি মিথ্যার বোঝা—
চিত্তের দাহ-ঢালা!

ফেনিল-মত্ত খ্যাতির তীব্র
সুধা-হলাহল ধারা
বিজলি চমকে করে না তাহারে
অন্ধ লক্ষ্যহারা।

দিশাহীন-গতি ক্ষুব্ধ বাসনা
গর্জ্জে না চিতে তার—
বৃথা ক্রন্দন গুমরি উঠে না
দুঃখ-সজল ধার।

নৃত্য-দোদুল চিত্ত তাহার
দ্বন্দ্বের দেশছাড়া,
মুক্ত স্বাধীন বিরাট পরাণ
সকল শঙ্কাহারা!

নিশিদিন ধরে হৃদয়ে তাহার
বাজে রে মোহন বাঁশি—
বিশ্ব ভরিয়া উঠে গো মন্ত্র—
"ভালবাস, ভালবাসি"।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়

স্বাভাবিক নেতা।

—:*:—

ভাষান্তরিত করলে বাক্যের রসভঙ্গ হয়, অনেক সময়ে অর্থভঙ্গও হয়। সেইজন্য আদিতে বাক্যটা যে ভাষায় ছিল, সেই ভাষাটা উদ্ধৃত করে দিলে বোঝবার সুবিধা হয়। এই প্রবন্ধের নামকরণে যে কথা দুটি ব্যবহার করছি, তার আদি ভাষাটা সেইজন্য এখানে দেওয়া অনাবশ্যক মনে করছি না। সেটা হচ্ছে "natural leader." অনুবাদ ঠিক হয় নি সন্দেহ হওয়াতেই বাক্যটার আদি ইংরেজী রূপ দিলাম।

আমাদের দেশের জমিদার মহাশয়রা এবং তাঁদের পক্ষসমর্থনকারীরা আমাদিগকে বোঝাতে চাচ্ছেন যে, তাঁরাই আমাদের "স্বাভাবিক নেতা", এবং ইচ্ছা করছেন যে আমরা যেমন তাঁদের কর্তৃত্বাধীন আছি তেমনি তাঁদের নেতৃত্বাধীন হই। কথা দুটির সামান্য অর্থ এই যে, তাঁরা আর আমরা (কৃষকেরা) এক দেশে একসঙ্গে জন্মেছি, এবং জন্ম থেকেই তাঁরা আমাদের সকল কাজে পরামর্শ দিয়ে এবং অন্য সকল রকমে সহায়তা করে আমাদের হিতসাধন করে থাকেন। কিন্তু কথাটা কি ঠিক?—প্রাচীন কালে যে, জমিদার নামে কোন পদার্থ ছিল, তার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৈদিক যুগে তৃণশষ্পযুক্ত উর্ব্বর জমির বন পরিষ্কার করে কৃষকেরা ক্ষেত করেছেন, গ্রাম স্থাপন করেছেন, এমন কথা দেশের প্রাচীন সাহিত্যে অনেক

পাওয়া যায়। তারপর বন্য জন্তু, ঘরের শত্রু, বাইরের শত্রু প্রভৃতি থেকে ক্ষেত্রের শস্য রক্ষা করতে, গোরুবাছুর রক্ষা করতে, গ্রাম রক্ষা করতে এবং এই সকল কাজের জন্য রাজার যা প্রাপ্য তা আদায় করতে রাজা কর্ম্মচারী নিযুক্ত করতেন। কর্ম্মচারীরা বেতন পেত। প্রজার সঙ্গে শঠতা করলে, প্রবঞ্চনা করলে, রাজা তার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতেন। মনুর ব্যবস্থা—"তেষাং সর্ব্বস্ব-মাদায় রাজা কুর্য্যাৎ প্রবাসনম্।" তখন রাজা এবং প্রজার মধ্যবর্ত্তী জমির উপস্বত্ব বা তার অংশভাগী কেউ ছিল না। পৌরাণিক যুগেও এই ব্যবস্থা ছিল। মুসলমান রাজারাও প্রথম প্রথমএর কিছু পরিবর্ত্তন করেন নি। তার অনেক পরে যখন বাঙলার নবাবেরা অধঃপাতের পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে অপরিশোধ্য ঋণে জড়িয়ে পড়ে বাঙলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী তাঁদিকে দিলেন, তখন প্রজার দেয় খাজনা আদায়ের ঠিকাদার-স্বরূপ (revenue farmer) জমিদারের সৃষ্টি হল। তাঁরা প্রজার পূর্ব্ব-জও নন্, সহ-জও নন্। অনেক স্থলে তাঁদের সৃষ্টি হয়েছে কালেক্টারীর নিলামঘরে। থর্ন্টন নামে একজন ইংরেজ কলিকাতা রিভিউ পত্রে এর একটি বেশ সুন্দর বর্ণনা দিয়েছিলেন। কালেক্টার সাহেব (এখনকার নয়, দেওয়ানী পাবার কিছু দিন পরে যখন রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রথম কালেক্টার নিযুক্ত হলেন) আফিসে আসীন। তাঁর দক্ষিণহস্তরূপে কানুনগো নিকটেই উপবিষ্ট। বন্দোবস্তের জন্য একটা জমিদারীর কাগজ পেশ হল। পূর্ব্ব বন্দোবস্তের কাগজ-পত্র পড়া হল। কালেক্টার সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, সে জমিদারীর জমিদারের নাম কি?—কানুনগো নাম বললেন। তার পর টাকার

কথা। এ বিষয়েও কানুনগোর কথাই কালেক্টার সাহেবের প্রধান নির্ভর। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার আরও কিছু বেশী দিতে চায় কি না, তা অবশ্য দেখা হল। তারপর দরদস্তুর করে এক জনের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়ে গেল। এই জমিদার সৃষ্টি-তত্ত্ব পৌরাণিক বিশ্বসৃষ্টি-তত্ত্বের মত উপকথা নয়। এর কাগজ-পত্র দলিল-দস্তাবেজ আছে, এবং জমিদারেরা তা বেশ জানেন। তা ছাড়া অনেক জমিদার আছেন যাঁদের কোন আদিপুরুষ বুদ্ধিবলে, বা কলমের বলে, অথবা বাহুবলে, জমিদারী করেছেন। এঁদের যে কেবল এই দেশেই আবির্ভাব, তা নয়। বিলেতের জমিদার সম্বন্ধে Hyndman বলেন, "the handful of marauders who now hold possession (of the land), have and can have no right save brute force against the tens of millions whom they wrong."

তারপর প্রজার সঙ্গে এঁরা কিরূপ ব্যবহার করেন, সেটা একবার দেখা যাক। সকলেই জানে যে তাঁরা খাজনা আদায়ের ঠিকাদার, শিষ্টাচারের অনুরোধে তাঁদিকে জমিদার বলা হয়। সে হিসেবে তাঁদের কাজ কেবল প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, কি আদায় করেন? সরকারী রিপোর্টে তার উত্তর এই—"The modern zamindar taxes his raiyats for every extravagance or necessity that circumstances may suggest, as his predecessors taxed them in the past. He will tax them for the support of his agents of various kinds and degrees, for the payment of his income tax and his postal cess, for the purchase of an

elephant for his own use, for the cost of the stationery of his establishment, for the cost of printing the forms of his rent receipts, for the payment of his lawyers. The milkman gives his milk, the oilman his oil, the weaver his clothes, the confectioner his sweetmeats, the fisherman his fish. The zamindar levies benevolences from his raiyats for a festival, for a religious ceremony, for a birth, for a marriage ; he exacts fees from them on all changes of their holding, on the exchange of leases and agreements, and on all transfers and sales ; he imposes a fine on them when he settles their petty disputes, and when the police or the magistrate visits his estates ; he levies blackmail on them when social scandals transpire, or when an affray or an offence is committed. He establishes his private pound near his cutchery, and realizes a fine for every head of cattle that is caught trespassing on the raiyat's crops. The abwab, as these illegal cesses are called, pervade the whole zamindari system. In every zamindari there is a naib, and under the naib there are gumastas ; under the gumastas there are piyadas or peons. The naib occasionally indulges in an ominous raid in the mofussil : one rupee is exacted

from every raiyat who has a rental, as he comes to proffer his respects. Collecting peons, when they are sent to summon raiyats to the landholders' cutchary, exact from them daily four or five annas as summons fees. (Administration Report, Bengal, 1872-73, page 23). অর্থাৎ—"অবস্থার তাড়নায় বা বিলাসিতার জন্য, অতীতে তাঁর পূর্ব্ব পুরুষেরা যেমন করতেন, এখনকার জমিদারও তেমনি, প্রজার কাছে নানারকম অবৈধ কর আদায় করেন। আমলার ভরণ পোষণের জন্য কিছু, আয়করের জন্য কিছু, ডাক-করের জন্য কিছু, নিজের ব্যবহারের জন্য একটা হাতী কেনা হয়েছে তার জন্য কিছু, তাঁর কাছারীর কাগজ কলমের জন্য কিছু, খাজনার রসিদের ফরম্ ছাপাবার জন্য কিছু, মোকদ্দমা-মামলার খরচের জন্য কিছু, প্রজার কাছ থেকে আদায় করা হয়। দুধ-ওয়ালা তাঁকে দুধ দেয়, তেলী তেল দেয়, তাঁতী কাপড় দেয়, ময়রা মিষ্টান্ন দেয়, জেলে মাছ দেয়। পর্ব্ব, পূজা, ব্রত, উৎসব, ছেলের জন্ম, বিবাহাদিতে প্রজাকে কিছু দিতে হয়। যোত-জমা হস্তান্তর করতে হলে, পাট্টা কবুলিয়ৎ বদলাতে হলে কিছু দিতে হয়। পুলিস বা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জমিদারীর মধ্যে এলে কিছু দিতে হয়। প্রজাদের মধ্যে সামান্য সামান্য বিবাদ বিসম্বাদ মেটাতে হলে কিছু দিতে হয়। পারিবারিক বা সামাজিক কোন কলঙ্কের কথা প্রকাশ হলে কিছু দিতে হয়। একটা মারামারি বা অন্য কোন ঘটনা হলে কিছু দিতে হয়। কাছারীর কাছে পাউণ্ড আছে, কারো গরু বাছুর কারো কিছু অনিষ্ট করলে জরিমানা দিতে হয়। এই সকলের নাম "আবওয়াব"। এই আব-

ওয়াব" ছাড়া জমিদারীর কোন কাজই নেই। সকল জমিদারেরই নায়েব আছেন, নায়েবের অধীনে গোমস্তা আছেন, গোমস্তার অধীনে পেয়াদা আছেন। নায়েব মহাশয় কখনো কখনো মফস্বলে অভিযান করেন, প্রজাকে অমনি একটি টাকা নজর দিতে হয়। কোনো কারণে কাছারীতে প্রজার ডাক হল, পেয়াদা ডাকতে গেল, অমনি তলব আনা স্বরূপ পেয়াদাকে দৈনিক চার আনা কি পাঁচ আনা দিতে হয়।" এ সকল কথা কল্পিত নয়। সরকারী রিপোর্টে আছে। আর জমিদারের সেরেস্তা খুঁজলে হিসাবের কাগজপত্রের মধ্যেও এর অনেক পাওয়া যেতে পারে। তবে সকল জমিদারই এর সকলগুলিই সকল প্রজার কাছ থেকে যে আদায় করেন, তা নয়। কিন্তু অনেকেই যে অনেক প্রজার কাছ থেকে এর অনেকগুলি আদায় করেন, তাতেও সন্দেহ নেই।

অনেক জমিদার আছেন যাঁরা খাজনা, আবওয়াব প্রভৃতি আদায় করবার কষ্ট স্বীকার করতে নিতান্ত নারাজ। তাঁরা কিছু লাভ রেখে তাঁদের ঠিকার অধীন ঠিকা দেন। এই অধীন ঠিকাদার বা পত্তনীদার আবার দর-পত্তনী দেন। দর-পত্তনীদার আবার সে-পত্তনী দেন, তিনি আবার তস্য অধীন পত্তনী দেন। সকলেই কিছু কিছু লাভ রেখে থাকেন। এত লোককে লাভ দিতে দিতে, থাকে না কেবল লাভ প্রজার। Baden-Powell বলেন—"This rent is calculated so as to leave a margin of profit, and above the sum payable to the zamindar and the revenue payable to Government, a margin which it depends on the lessee's skill and ability to make more

and more * * In some places there are as many as a dozen gradations between the zamindar at the top and the cultivator of the soil at the bottom." সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই যে—উপরে জমিদার আর নীচে কৃষক, এর মধ্যে পত্তনীদার, দর-পত্তনীদার প্রভৃতি অনেকগুলি থাকেন, এবং সকলেই বুদ্ধি ও নিপুণতার সহিত এমন হিসাব করে খাজনা আদায় করেন, যে জমিদারকে তাঁর খাজনা এবং গবর্ণমেণ্টকে তাঁদের রাজস্ব দিয়েও সকলেরই যথেষ্ট লাভ থাকে। Baden Powell এই পত্তনীদার সম্বন্ধে বলেন যে, এই সুচতুর ব্যক্তিটির জমিদারীতে এইমাত্র স্বার্থ যে, তিনি যত পারেন নিজের লাভ করে নেন। তাঁর মনে এ কথা উদয়ই হয় না যে, তাঁর চোষণের পরে যা থাকবে তা শুকনো, নীরস। ব্যাডেন-পাওএলের ভাষায় "Such a person had no other interest but to amass the largest profit to himself, regardless whether on going out he left behind him an estate sucked dry and tenants verging on misery." ১৮৪৩ সালে এই পত্তনী-প্রথা সম্বন্ধে বলা হয়েছিল "Striking its roots all over the country and grinding down the poorer classes to bare subsistence." (Land Systems of British India,—page 638).

তবেই দেখা যাচ্ছে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে—একশ' বৎসরের কিছু বেশি হল—এই জমিদার সম্প্রদায় শ্রীযুক্ত ঈষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়েছেন। বন্দোবস্তটা চিরস্থায়ী হলেও, ছল-বল-কৌশল-খরিদ-বিক্রী-দান-প্রভৃতি দ্বারা অনেক জমিদারী

হস্তান্তরিত হয়েছে এবং নতুন জমিদারের সৃষ্টি হয়েছে। এঁরা সকলেই পত্তনীদার দরপত্তনীদার সমেত, আমাদের "স্বাভাবিক নেতা", অর্থাৎ—"natural leaders." উত্তরাধিকার-সূত্রটা, যেটা natural leader-এর প্রধান অবলম্বন, যখন খণ্ড খণ্ড হয়ে ছিঁড়ে গিয়েছে, তখন এঁদিকে natural leader না বলে ex-officio leader বললে কেমন হয়? Ex-officio-কে ভাষান্তরিত করে আর বাক্যের রসভঙ্গ করব না।

শ্রীহৃষীকেশ সেন।

সত্য-দৃষ্টি।

—:০:—

চিত্ত মোর দগ্ধ কর নিত্য দুঃখ-দানে,
নিরানন্দ শান্তিহারা হোক্ এ জীবন,
ক্ষতি তাহে নাহি নাথ,—শুধু মোর প্রাণে
দিয়োনা জড়ায়ে যেন মোহ-আবরণ।
সত্যের জ্বলন্ত মূর্ত্তি কর প্রজ্বলিত,
মিথ্যা মোহ দূরে যাক্; সেও মোর ভালো
যদি প্রাণ হয় তাহে দুঃখে জর্জ্জরিত,
ব্যথাবিদ্ধ;—নাহি চাই আলেয়ার আলো।
জানি তুমি মোর ভাগ্যে লেখ নাই সুখ,
নয়নের স্নিগ্ধ হাসি, স্নেহ ভালবাসা;
হোক তাই, তার লাগি হব না বিমুখ।
শুধু মোর প্রাণে জাগে এইটুকু আশা,
উচ্চশিরে বলে যাব, চলে যাব যবে—
সত্যের দেখেছি শক্তি জীবন-আহবে।

শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী

স্মৃতির ক্ষণিকতা।

ভুলে যাও, ভুলে যাও, সবে মোরে বলে,
ভুলে যাও দুঃখ তার, সব তার স্মৃতি,
মালাও ত্যজিতে হয় পুষ্প শুষ্ক হলে,
ভুলে পুরাতন আজি গাও নব গীতি।
ভোলা যে সহজ, তাহা খুবই আমি জানি—
এ জগতে কিবা মোরা নিমেষে না ভুলি ?
একান্ত যাহারে মোরা আপনার মানি,
ক্রমে ম্লান হয়ে আসে তারও স্মৃতিগুলি।
তাই বলি, থাক্ স্মৃতি থাকে যত দিন,
মনোমাঝে থাকে থাক্ নিদারুণ ব্যথা—
সান্ধ্যমেঘে আভা সম বিষণ্ণ মলিন,
থাকুক্ জাগিয়া মনে যত তার কথা !
তার পর যদি ধীরে নামে অন্ধকার,
আপনিই লুপ্ত হবে শেষ-আলো তার !

শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী

মোস্‌লেম ভারত।*

আমি "সওগাত" থেকে ওমর খৈয়াম সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করে দিয়েছি, তার ভূমিকায় স্বজাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে, বঙ্গভাষা শুধু আমাদের নয়, মুসলমানদেরও মাতৃভাষা। এ জ্ঞান যে বাঙলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মনেও দিব্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তার পরিচয় পেয়ে যারপর নাই সুখী হলুম। সদ্যপ্রকাশিত মাসিকপত্র "মোস্‌লেম ভারত"-এর মুখপত্রে সম্পাদক মহাশয় "আমাদের কথা" বলে যে ক'টি কথা বলেছেন, সে ক'টি আমাদেরও কথা। সম্পাদক মহাশয়ের কথা এই ঃ—

"বর্ত্তমানে আমাদের "সাহিত্যিক সমাজ" বলিলে কেবল মুসলমান সমাজকেই বুঝাইবে না। পরন্তু বঙ্গদেশবাসী বঙ্গভাষাভাষী হিন্দু মুসলমান মানবসঙ্ঘকেই বুঝাইবে। হউক হিন্দুর ধর্ম্ম ভিন্ন, আর মুসলমানের ধর্ম্ম অন্য, কিন্তু জন্মভূমিগত এবং ভাষাগত হিসাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এক,—উভয়েই এক প্রকৃতির নিয়মনিগড়ে নিবদ্ধ। * * আজ মুসলমানগণ বঙ্গভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছেন, এমন কি অন্দরমহলের ভিতরেও বঙ্গভাষার স্বর্ণ-সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত। আজ মুসলমানগণ মনে-প্রাণে বুঝিয়াছেন যে, হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিতে হইলে বাঙলা ভাষার আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই।"

* সচিত্র মাসিক পত্র, বার্ষিক মূল্য চারি টাকা। কলিকাতা, ৩ কলেজ স্কোয়ার ইষ্ট, মোসলেম পাব্‌লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক মৌলভী মোজাম্মেল হক্।

এ কথা কটি যেমন স্পষ্ট তেমনি সত্য।

পূর্ব্বোক্ত ভূমিকা আমি এই বলে শেষ করি যে, হিন্দু মুসলমানের যে মিলনের চেষ্টা আজ রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র লক্ষিত হচ্ছে, সে মিলন প্রকৃতপক্ষে সাধিত হবে বঙ্গ সাহিত্যের ক্ষেত্রে। দেখতে পাচ্ছি "মোসলেম ভারত"-এর সম্পাদক মহাশয়ও এ বিষয়ে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তিনি বলেন :—

"আমাদের মনে হয়, যদি কোনদিন বঙ্গজননীর যুগল সন্তান, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে স্থায়ী সম্মিলন সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে এই বাঙ্গালা সাহিত্যের এই মহা মিলনের ক্ষেত্রেই তাহার আশা করা যাইতে পারে"।

এ আশা ভিত্তিহীন নয়। যে লেখার ভিতর প্রচলিত সামাজিক মনোভাবের অতিরিক্ত কিছু নেই, সে লেখা সাহিত্য নয়—তাই একথা জোর করে বলা চলে যে, সাহিত্যরাজ্যে হিন্দু শুধু হিন্দু নন, তার অতিরিক্ত কিছু; এবং মুসলমানও শুধু মুসলমান নন, তার অতিরিক্ত কিছু। এই অতির দেশই সকল সাহিত্যিকের স্বদেশ।

সাহিত্য বলতে কি বোঝায়, সে বিষয়ে, "মোস্‌লেম ভারতে" একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কাজী আবদুল ওদুদের "সাহিত্যিকের সাধনা"র মহা গুণ এই যে, উক্ত প্রবন্ধে বিষয়টিকে নানাদিক থেকে দেখা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে বিচার করাও হয়েছে। এহেন সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাঙলা মাসিকপত্রে নিত্য চোখে পড়ে না। সাহিত্য যাঁরা ভালবাসেন, এ লেখাটি তাঁদের আমি পড়তে অনুরোধ করি। এস্থলে আমি এ কথাটি বলা আবশ্যক মনে করি যে, প্রবন্ধ লেখকের বেশির ভাগ মত আমি খাঁটি বলে মেনে নিই।

বাঙলা ভাষার উপর কাজীসাহেবের কতদূর অধিকার আছে, তার

প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ইংরাজি পদের ভাষায় অনুবাদে। "সমূহতন্ত্র" কি socialism-এর মন্দ তরজমা? তারপর "ভাব-বিলাস" যে sentimentalism-এর অতি চমৎকার তরজমা, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। Sentimentalism যে এতটা হেয়, তার কারণ ও-বস্তু হচ্ছে বিলাসের একটি অঙ্গ। আর বিলাসী-দেহের চেয়ে বিলাসী-মন যে মানুষের পক্ষে বেশি মারাত্মক, এ কথা দেহাত্ম-বাদী ছাড়া অপর সকলেই মানতে বাধ্য।

আমি মনোবাক্যে "মোস্‌লেম ভারত"-এর শুভকামনা করি। আমার মনে এ আশাও আছে যে, মুসলমান সাহিত্যিকদের হাতে বাঙলা গদ্য সরল ও তরল হয়ে উঠবে। কারণ আমাদের মত সংস্কৃতের গুরুভার তাঁদের বহন করে চলতে হয় না। আর সংস্কৃত ভাষার আর যতই গুণ থাক, ক্ষিপ্রতা নামক ধর্ম্ম তার শরীরে নেই। আর এ কথাও শুনতে পাই যে, ফার্‌সি ভাষার আর যে ত্রুটিই থাকুক, সে ভাষা স্থূলকায় নয়। সুতরাং ফার্‌সি-নবীশদের হাতে বাঙলা ভাষার ফূর্ত্তি যে নষ্ট হবে না, এ আশা কি অসঙ্গত?

আকবর বাদশাহ্‌র দরবারে দুটি গুণী চিত্রকর ছিলেন। আকবর শাহ্ তাঁদের একজনের নাম দিয়েছিলেন "জরীন্-কলম", আর একজনের "শিরীন্-কলম"। আশা করি মুসলমান লেখকদের হাতে আমরা আবার "জরীর কলম" ও "চিনির কলমের" সাক্ষাৎ পাব।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।